সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

دعوة الله দাওয়াহ ইলাল্লাহ

DAWAHILALLAH 1441 H. || 2020 || ISSUE - 6

সূচিপত্র

আল-কোরআন

০৪| অত্যাচারী কাফেরদের দুনিয়াতেই শাস্তি অনিবার্য।

০৮| সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব- যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)

১১| সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (দ্বিতীয় পর্ব- মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)

১৪| সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ (তৃতীয় পর্ব- জিহাদের আসবাবের প্রতি ভালোবাসা, তার পরিচর্যা এবং একে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা)

আল-জিহাদ

১৫| আমদের না হয় বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু আল্লাহকে কি বুঝাবেন???

২০| ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (পঞ্চম পর্ব)

২৩| ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা (শেষ পর্ব)

আল-হাদীস

২৭| আহলে হাদিসদের সংশয়; গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

৩১| মুজাহিদীন হিন্দুস্তান (ভারত) বিজয় করবেন, ইনশাআল্লাহ....

৩৩| মুমিনের ৫ দফা কর্মসূচি...

চিঠি ও বার্তা

৩৪| সম্মানিতা মা ও বোনদের প্রতি দ্বীনের এক অধম ভাইয়ের চিঠি...

৩৮| এই জুলুমের শেষ কোথায়

৩৯| প্রত্যেক যুগেই সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর জন্ম হয় ! কিন্তু...

৪০| আবারো হাসবে সেই সূর্যটা !

তাযকিয়াতুন নাফস

৪১| করোনা লকডাউন এবং এক ভাইয়ের প্রশ্নঃ "এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

৪৫| দ্বীনি ভাইদের প্রতি এক মুহাজিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহাহ

৪৭| করোনা সংক্রমণে “আতংকিত নয়, সচেতন হোন”

৫০| মহামারী ও সঙ্কটময় মুহূর্তের কিছু আমল

৫২| ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যে নাকি করোনা’র জন্যে

৫৬| মুজাহিদীনদের ব্যাপারে এলাকায় শত্রু কমানোর অভিজ্ঞতা

নাশিদ

৫৮| একটি উৎসাহমূলক কবিতা

সাবিলুনা ‘আল-জিহাদ’

ফতোয়া

৫৯| সংক্রমণের ভয়ে হত্যার বিধান কী ?

ফিতনা

৬০| চুক্তি এবং কিছু কথা

৬৪| কাশ্মীর নিয়ে সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি ও রূপক ঘটনা!

৬৬| কেন আমাদের উপর করোনা ভাইরাস আসলো? আসুন! কুরআন এবং হাদিস থেকে জেনে নেই

৬৮| অনলাইনকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি?

মানহায

৬৯| অবুঝ ভাইদের দৃষ্টিতে দ্বীন-ই-ইলাহী কি সময়ের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ?!

৭০| ভাইরাসে নয়, ক্বিতালের মাধ্যমেই মু'মিনদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে

৭২| আমাদের জন্য অন্ধভক্তি এবং অন্ধ বিদ্বেষ থেকে বাঁচার কৌশলী উপায়:

৭৪| এই যুগের আইয়ুবীর পরিচয়ঃ এসো কাফেলাবদ্ধ হই।

৭৭| এখন সময় এসেছে কথাকে আ'মলে পরিণত করার

শরীয়তের আহকাম

৭৯| যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে - ২৮
দশ - যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

৮০| যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৯
এগার. বাগি

৮০| যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- শেষ পর্ব

৮২| শিক্ষণীয় গল্প | সত্যের সন্ধানে | পর্ব: ০১

৮৭| একটি প্রশ্নের উত্তর:- নারীদের জন্য পুরুষদের ছবি-ভিডিও দেখার বিধান

৯০| পিতার সমীপে সন্তানের বিনম্র জবাব

৯৪| যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৫ শাসকের পাপাচার ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া)

৯৯| করোনা মহামারি ০১. সংক্রামক ব্যাধি - ০২

১০০| করোনা মহামারি ০২. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা- ০১

১০২| ভাইরাস হতে পুরো পৃথিবীর মুক্তির জন্য দোয়া; ওয়ালা-বারার দুঃখজনক বিস্মৃতি

সংশয় নিরসন

১০৫| তামিম আদনানিকে নিয়ে সংশয়ের জওয়াব

১১০| দাজ্জালের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ আপনার দ্বারপ্রান্তে!!! আপনি কি এখনো সন্দিহান??? (দলীলসমূহ ও বিশ্লেষণ) পর্ব- ১

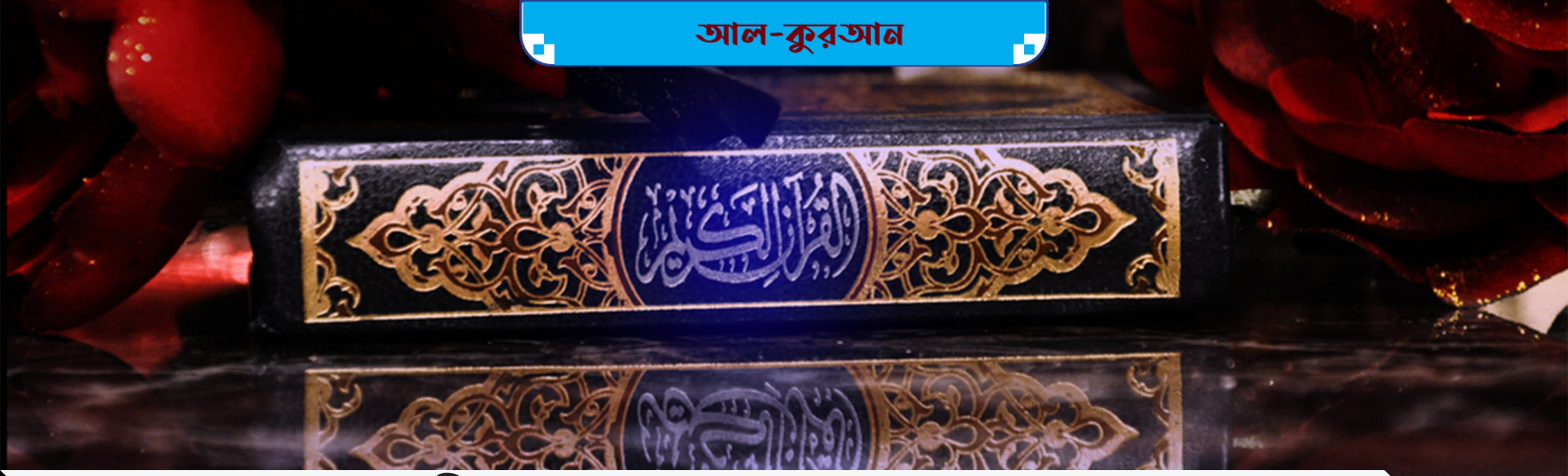

অত্যাচারী কাফেরদের দুনিয়াতেই শাস্তি অনিবার্য

আদনানমারুফ

যে কাফেররা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে বা করছে তারা একদিন না একদিন শাস্তি পাবেই। আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, তিনি দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের শাস্তি দিয়ে মাজলুম মুসলমানদের হৃদয় প্রশান্ত করবেন, আর আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম ঘটে না, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করবো, যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে।" *(সূরা গাফির, ৫১)*

এ আয়াতের অধীনে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. অত্যন্ত চমৎকার হৃদয়-জুড়ানো আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা ভাইদের সাথে শেয়ার করার জন্যই এ লেখার অবতারণা। ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

قد أورد أبو جعفر بن جرير، رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا} سؤالا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين : أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاما، والمراد به البعض، قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم، وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا صلب المسيح، عليه السلام، من اليهود، فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا، ويقر أعينهم ممن آذاهم، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب". وفي الحديث الآخر: "إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب"؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأهل مدين، وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين، فلم يهلك منهم أحدا وعذب الكافرين، فلم يفلت منهم أحدا.

قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم، فيطلب بدمائ هم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت (10) الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا، وهم منصورون فيها(تفسير ابن كثير ت سلامة 7/150 دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420هـ

"ইমাম ইবনে জারীর তবারী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তিনি বলেন, (কুরআন-সুন্নাহ হতে) নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, কোন কোন নবীকে তার গোত্র হত্যা করে ফেলেছে, যেমন ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া আলাইহিস সালাম। কোন নবী তার জাতিকে ছেড়ে হিজরত করেছেন। ইসা আলাইহিস সালাম আকাশে চলে গেছেন। তাহলে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করলেন কোথায়?

এরপর তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আয়াতে 'সাহায্য করবেন' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা নবী ও মুমিনদের কষ্ট দিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে তিনি কাফেরদের উপর প্রতিশোধ নিবেন। তবে এই প্রতিশোধ মাজলুমদের জীবদ্দশায়ও হতে পারে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর, তাদের উপস্থিতিতেও হতে পারে কিংবা তাদের হিজরত করে চলে যাওয়ার পর।

(যারা অত্যাচার করেছে তাদের উপরও আযাব আসতে পারে কিংবা তাদের উত্তরসূরিদের উপর, যারা পূর্বসূরিদের অত্যাচারে সন্তুষ্ট এবং সুযোগ পেলে নিজেরাও অত্যাচারের ইচ্ছা পোষণ করে)

এই প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তেই তিনি যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার হত্যাকারীদের তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের হত্যা করেছে। বর্ণনা করা হয়, আল্লাহ তায়ালা (ইবরাহীমের হিজরতের পর ইবরাহীমকে আগুনে নিক্ষেপকারী বাদশাহ) নমরুদকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। আর যে ইহুদীরা ইসা আলাইহিস সালামকে শূলীতে চড়াতে চেয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রোমানদের চাপিয়ে দিয়েছেন, যারা তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেছে। অতঃপর কিয়ামতের পূর্বে ইসা আলাইহিস সালাম আসমান হতে অবতরণ করে দাজ্জাল ও তার বাহিনী ইহুদীদের হত্যা করবেন। তিনি শুকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জিযয়ার বিধান রহিত করে দিবেন। যারাই ইসলামগ্রহণ করবে না তাদের সবাইকে তিনি (পাইকারীহারে) হত্যা করবেন। এরচেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কী হতে পারে?

বস্তুত, এটাই আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী রীতি, তিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের সাহায্য করেন, যারা তাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের শাস্তি দিয়ে তিনি মুমিনদের চক্ষু শীতল করেন। সহিহ বুখারীতে আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, "যে আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুরা করে সে প্রকাশ্যে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে"। অপর হাদিসে এসেছে, "আমি আমার বন্ধুদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি যেমনিভাবে ক্ষীপ্ত সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নুহ ও লুত আলাইহিস সালামের গোত্র, আদ ও সামুদ জাতি, মাদয়ানবাসী সহ আরো যারা হকের বিরোধীতা করেছে, নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন তাদের সকলকে শাস্তি দিয়েছেন, কাউকে ছাড়েননি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে মুমিনদের মুক্তি দান করেছেন, কোন মুমিনকে ধ্বংস করেননি। সুদ্দী রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখনই কোন নবী বা মুমিনদের কোন দলকে কাফেরদের নিকট দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন আর তারা তাঁদের হত্যা করেছে, তো সেই প্রজন্ম শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউকে প্রেরণ করেন। তাই রাসূলগণ দুনিয়াতে নিহত হলেও তারা বিজয়ী, সাহায্যপ্রাপ্ত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/১৫০)

এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উপর যে কাফেররা অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তায়ালা অধিকাংশ সময়ই দুই পদ্ধতিতে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন, হয়তো তাদের উপর অন্য কোন কাফেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন, কিংবা আসমানী গযব নাযিল করেছেন। যেহেতু পূর্ববর্তী অধিকাংশ নবীদের শরিয়তেই জিহাদ ছিলো না তাই তাদের শাস্তির জন্য এ ধরণের ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু উম্মতে মুসলিমার উপর যে কাফেররা অত্যাচার করবে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার রীতি হলো, আল্লাহ তায়ালা সাধারণত এই উম্মতের মুজাহিদিনের হাতেই তাদের শাস্তি দেন। এতে মাজলূম মুসলমানদের অধিক হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। ইসলামে জিহাদ বিধান থাকার এটিও একটি বড় হিকমত। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর নির্মম নির্যাতনকারী চিনা মালাউনরা করোনা ভাইরাসে মরলেও আমাদের অন্তরে শান্তি আসে, কিন্তু এই মালাউনদের নিজ হাতে কোপাতে পারলে নিঃসন্দেহে আমাদের অন্তর আরো বেশি প্রশান্তি লাভ করতো।

"আল্লাহ তায়ালা সাধারণত এই উম্মতের মুজাহিদিনের হাতেই তাদের শাস্তি দেন। এতে মাজলূম মুসলমানদের অধিক হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। ইসলামে জিহাদ বিধান থাকার এটিও একটি বড় হিকমত। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের উপর নির্মম নির্যাতনকারী চিনা মালাউনরা করোনা ভাইরাসে মরলেও আমাদের অন্তরে শান্তি আসে, কিন্তু এই মালাউনদের নিজ হাতে কোপাতে পারলে নিঃসন্দেহে আমাদের অন্তর আরো বেশি প্রশান্তি লাভ করতো।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যাতে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহর জ্ঞানও পরিপূর্ণ, তাঁর হিকমত পরিপূর্ণ। (সূরা তাওবা, ১৪-১৫)

আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী বলেন, "এই আয়াতে জিহাদ শরিয়তসম্মত হওয়ার মূল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী উম্মতের যে কাহিনীগুলো বিবৃত হয়েছে তা থেকে বুঝে আসে যে, যখন কোন জাতি কুফর ও নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতো তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাদের উপর ভয়াবহ শাস্তি প্রেরণ করা হতো। যার মাধ্যমে তাদের কুফর ও খারাবী মূহুর্তে শেষ হয়ে যেতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"আমি তাদের প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছি পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো-ঝঞ্ঝা, কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করেছে মহানাদ, কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছি এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করেছি নিমজ্জিত। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি যুলুম করবেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।" (সূরা আনকাবুত, ৪০)

নিঃসন্দেহে এই শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দুনিয়াতে নিজেদের লাঞ্ছনা ও জিল্লতি দেখে যেতে পারে না এবং তাওবা করে সত্যের দিকে ফিরে আসারও সুযোগ পায় না। তাই আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, যেন হঠকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের তিনি নিজে সরাসরি শাস্তি দেবার পরিবর্তে তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের মাধ্যমে শাস্তি দেন। এভাবে শাস্তি দেয়া হলে, অপরাধীদের জিল্লতি এবং মুমিনদের মর্যাদাবৃদ্ধি বেশি হয়, বিশ্বস্ত বান্দাদের বিজয় ও প্রতাপ প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর যায়, তাঁদের অন্তর এটা দেখে সান্তনা লাভ করে যে, গতকাল পর্যন্ত যারা তাঁদের তুচ্ছ ও দূর্বল মনে করে যুলুম করতো, তাঁদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো আজ তারাই তাঁদের করুণাপ্রার্থী, তাঁদের হাতেই ওদের ভাগ্য। যে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমরা কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করতে পেরে অন্তরে রাগ চেপে রাখতো, জিহাদের মাধ্যমে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অধিকন্তু অপরাধীদের জন্যও শাস্তি প্রদানের এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর। কেননা এক্ষেত্রে শাস্তি পাবার পরও তাওবা করে সত্যধর্ম গ্রহণের পথ খোলা থাকে। অনেক সময়ই শাস্তির ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বহু অপরাধী তাওবা করার সৌভাগ্য লাভ করে। তাই তো রাসূলের যমানায় জিহাদের কল্যাণে অল্প দিনেই পুরো আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল।" (তাফসীরে উসমানী, পৃ: ২৪৪ ফরিদ বুক ডিপো।)

বস্তুত, এটাই আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী রীতি, তিনি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের সাহায্য করেন, যারা তাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের শাস্তি দিয়ে তিনি মুমিনদের চক্ষু শীতল করেন। সহিহ বুখারীতে আবু হুরাইরা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, "যে আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুরা করে সে প্রকাশ্যে আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে"। অপর হাদিসে এসেছে, "আমি আমার বন্ধুদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করি যেমনিভাবে ক্ষীপ্ত সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নুহ ও লুত আলাইহিস সালামের গোত্র, আদ ও সামুদ জাতি, মাদয়ানবাসী সহ আরো যারা হকের বিরোধীতা করেছে, নবীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন তাদের সকলকে শাস্তি দিয়েছেন, কাউকে ছাড়েননি। কিন্তু তাদের মধ্য হতে মুমিনদের মুক্তি দান করেছেন, কোন মুমিনকে ধ্বংস করেননি।

কমেন্ট

আ লী
ইবনুল মাদীনী

ভাই!
ফেসবুকে একটা লেখা দেখলাম "ইমাম শাফেঈ (রঃ) এর কাছে জিঝিয়ার কোন বিধান নেই"। অর্থাৎ কাফেরদেরকে প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হবে ঈমান না আনলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কেমন যেন জিযয়ার আলোচনা না থাকাতে তারা জিযয়িয়া দিয়েও মুসলিম দেশে থাকতে পারবে না। এ বিষয়ে আপনার শাফেয়ি মাজহাবের কোন কিতাব দেখা আছে?

বিষয়টা পুরোপুরি এমন নয়। ইহুদী-খৃষ্টান ও অগ্নীপূজারী এই তিন শ্রেণীর কাফেরদের থেকে জিযয়া গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে চারো মাযহাব একমত। তেমনিভাবে মুরতাদদের থেকে জিযয়া গ্রহন অবৈধ হওয়ার ব্যাপারেও সবাই একমত। তবে মুশরিকদের থেকে জিযয়াগ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী মুশরিকদের থেকে জিযয়াগ্রহণ করা জায়েয নেই। তাদের ক্ষেত্রে বিধান হলো হয়তো তারা ইসলামগ্রহণ করবে নতুবা তাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুশরিকদের থেকেও জিযয়া নিয়ে তাদেরকে দারুল ইসলামে বসবাসের সুযোগ দেওয়া বৈধ। ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

المغني لابن قدامة (9/ 328) مسألة قال (ولا تقبل الجزية إلا من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه) وجملته أن الذين تقبل منهم الجزية صنفان، أهل كتاب، ومن له شبهة كتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، كالسامرة يدينون بالتوراة، ويعملون بشريعة موسى – عليه السلام –، وإنما خالفوهم في فروع دينهم. وفرق النصارى من اليعقوبية، والنسطورية، والملكية، والفرنج والروم، والأرمن، وغيرهم، ممن دان بالإنجيل وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس فإنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم، وأخذ الجزية منهم. ولم ينتهض في إباحة نكاح نسائهم ولا ذبائحهم دليل. هذا قول أكثر أهل العلم إن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع. لا نعلم في هذا خلافا مسألة

قال: (ومن سواهم، فالإسلام أو القتل) يعني من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية، ولا يقرون بها، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا، هذا ظاهر مذهب أحمد، وروى عنه الحسن بن ثواب، أنها تقبل من جميع الكفار، إلا عبدة الأوثان من العرب، لأن حديث بريدة يدل بعمومه على قبول الجزية من كل كافر، إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من العرب، لتغلظ كفرهم من وجهين، أحدهما، دينهم، والثاني، كونهم من رهط النبي – صلى الله عليه وسلم –. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس، لكن في أهل الكتب غير اليهود والنصارى، مثل أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود ومن تمسك بدين آدم وإدريس وجهان، أحدهما، يقرون بال والنصارى. وقال أبو حنيفة: تقبل من جميع الكفار إلا العرب

আদনান মারুফ

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ
(প্রথম পর্ব- যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত)

আদনান মারুফ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্যও আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

(হে নবী!) আমি তোমাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভিতর দিয়ে তোমার কাছে যে বাণী এসেছে তা স্বয়ং সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মারক। -সূরা হুদ, ১২০

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের ঘটনা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:-

১. আহলে হক হকের উপর অটল-অবিচল থাকা। বাতিলের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও বিরোধিতার কারণে হক থেকে বিচ্যুত না হওয়া। কারণ যখন আহলে হক কুরআনের দর্পণে দেখতে পাবে, তাদের অবস্থা ও তাদের বিরোধীদের অবস্থা পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের বিরোধীদের অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে, তখন তারা নিজেদের হক্কানিয়্যাতের বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হবে। তেমনিভাবে যখন তারা জানতে পারবে বাতিলের সকল প্রকার আস্ফালন ও চোখরাঙ্গানি সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে বিজয় ও শুভ পরিণতি মুমিনদের নসীবেই থেকেছে তখন তারা বর্তমানের সাময়িক দুঃখ-কষ্ট বা অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে হক থেকে ছিটকে পড়বে না।

২. এসব ঘটনাবলী মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। মুমিনগণ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উত্তম গুণাবলী জানতে পেরে তার অনুসরণের প্রয়াস পায় এবং কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের খারাপ গুণাবলী ও বদ অভ্যাসগুলো জানতে পেরে তা বর্জন করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমরা সাধারণত এ ঘটনাবলী অনেকটা ইতিহাসের ন্যায় পড়ে যাই। অথচ কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়। এজন্যই কুরআন নবীদের ঘটনাবলী ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করে না। এমনকি অনেক সময় বিস্তারিত না বলার কারণে পাঠক তৃষিত থেকে যায়। আলেমগণ এর কারণ হিসেবে বলেছেন, নবীদের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে পাঠক ইতিহাসের অলিগলিতেই হারিয়ে যাবে। ইতিহাসের সুখপাঠ্যে তন্ময় হয়ে যাওয়ায় কুরআনের মূল লক্ষ্য, অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণে ব্যত্যয় ঘটবে। -মাআরিফুল কুরআন, ৫/১৬

সুতরাং কুরআনের ঘটনাবলী তাদাব্বুরের সাথে পড়া জরুরী। এখন যারা তাফসীরের কিতাবাদি পড়েন তাদের বেশিরভাগও শুধু কিতাব পড়েই ক্ষান্ত করেন। অথচ তাফসীরের কিতাবাদিতেও শিক্ষাটা বর্ণনা করা হয় না। তাই তাফসীরের কিতাবাদিও হলো মাধ্যম। মূল শিক্ষা অর্জন হবে তাদাব্বুরের দ্বারা। আর তাদাব্বুরের শিক্ষা অর্জন করা খুবই সহজ।

আল্লাহ তায়ালা বারবার বলেছেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশগ্রহণ কারী। -সূরা কমার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০,

কিন্তু কেন জানি এই সহজ কাজটিই আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। হাজার হাজার পৃষ্ঠার কিতাবাদি পড়ে ফেললেও প্রতিদিন কুরআন নিয়ে অন্তত ৫-১০ মিনিট তাদাব্বুর করার ফুরসত আমাদের হয় না। তাই এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কুরআন থেকে শিক্ষা অর্জনের ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে না দিয়ে এ ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা। যদিও কুরআন জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র, এর ইলম ও শিক্ষা অর্জন ও বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, তবুও একেবারে না হওয়ার চেয়ে যতটুকু হয় ততটুকুই কল্যাণ। এরই ধারাবাহিকতায় এবার আমরা সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনাবলী থেকে কিছু শিক্ষা অর্জন করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এরপর ধারাবাহিকভাবে কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী, মুমিনদের গুণাবলী এবং মুনাফিক-কাফের-মুশরিকদের বদ স্বভাব ও খারাপ বিষয়াদি থেকে শিক্ষাগ্রহণের প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

এসব ঘটনাবলী মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। মুমিনগণ পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের উত্তম গুণাবলী জানতে পেরে তার অনুসরণের প্রয়াস পায় এবং কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের খারাপ গুণাবলী ও বদ অভ্যাসগুলো জানতে পেরে তা বর্জন করার চেষ্টা করে।

সাবার রাণী ও তার অধিনস্তদের যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত

قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37))

"(সুতরাং হুদহুদ চিঠি পৌঁছে দিল। তারপর) রাণী (তার দরবারের লোকদেরকে) বললো, হে জাতির নেতৃবর্গ! আমার সামনে একটি মর্যাদাসম্পন্ন চিঠি ফেলা হয়েছে। তা এসেছে সুলাইমানের পক্ষ থেকে। তার শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে, যিনি রহমান ও রহীম। (তাতে সে লিখেছে) আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। রাণী বললো, ওহে জাতির নেতৃবৃন্দ! যে সমস্যাটি আমার সামনে দেখা দিয়েছে, এ বিষয়ে তোমরা আমাকে সিদ্ধান্তমূলক পরামর্শ দাও। আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শক্তিশালী লোক এবং প্রচণ্ড লড়াকু। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আপনার। সুতরাং ভেবে দেখুন কি হুকুম দেবেন। রাণী বললো, প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে ঢুকে পড়ে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, এবং তার মর্যাদাবান বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ে। এরাও তো তাই করবে। বরং আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো। তারপর দেখবো দূত কি উত্তর নিয়ে ফেরে। তারপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে উপস্থিত হলো, সে বললো, তোমরা কি অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল। ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সেনাদল নিয়ে আসবো, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই এবং আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেবো আর তারা হয়ে যাবে বশীভূত।" -সূরা নামল, ২৯-৩৭

আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

والظاهر أن سليمان، عليه السلام، لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية، ولا اعتنى به، بل أعرض عنه، وقال منكرا عليهم: {أتمدونني بمال} أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم؟! {فما آتاني الله خير مما آتاكم} أي: الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، {بل أنتم بهديتكم تفرحون} أي: أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. (تفسير ابن

"বাস্তবতা এই যে, বিলকীস যা কিছু পাঠিয়েছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আদৌ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি। বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, **তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে তুষ্ট করতে চাও যেন আমি তোমাদেরকে তোমাদের শিরকের অবস্থায়ই ছেড়ে দেই। আল্লাহ আমাকে যে সম্পদ ও সৈন্যবাহিনী দিয়েছেন তা তোমাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা তো হাদিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কিন্তু আমি ইসলাম অথবা তরবারী ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করবো না।"** -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬/১৯১

বর্তমানে যারা কাফেরদের সুরে সুর মিলিয়ে ধর্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা এ ঘটনার কি জবাব দেবেন? এখানে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবার রাণী ও তার সাম্রাজ্যের লোকদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছিলেন না চাপপ্রয়োগ করে তাদের মুসলিম হতে বাধ্য করেছেন? এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এটা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম, তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সহ অন্যান্য নবীদের আলোচনা করে আমাদেকে তাদের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"(উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো) তারা ছিল এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হিদায়াত দান করেছিলেন। সুতরাং তুমি তাদের পথেই চলো।"
(সূরা আনআম, ৯০)

যদি পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনাবলী আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ না হয় তবে এ ঘটনাবলী কুরআনে থাকার দ্বারা কি ফায়দা? অথচ কুরআনের অধিকাংশ জুড়েই তো রয়েছে পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতের কাহিনী!

বর্তমানে যারা কাফেরদের সুরে সুর মিলিয়ে ধর্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেন, তারা এ ঘটনার কি জবাব দেবেন? এখানে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবার রাণী ও তার সাম্রাজ্যের লোকদের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে দিয়েছিলেন না চাপপ্রয়োগ করে তাদের মুসলিম হতে বাধ্য করেছেন? এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, এটা পূর্ববর্তী নবীদের ধর্ম, তা আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালাম সহ অন্যান্য নবীদের আলোচনা করার আমাদের তাদের অনুসরণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন

আর আমাদের নবীর ধর্মও তো সুলাইমান আলাইহিস সালামের ধর্মের মতই। শুধু তাতে জিযিয়ার বিধানটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো নতুবা তরবারী। আর আমাদের নবী বলতেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা জিযিয়া প্রদান করো, অন্যথায় তরবারী। -সহিহ মুসলিম, ১৭৩১ জামে' তিরমিযি, ১৫৪৮

এমনকি পারস্যের সেনাপতি রুস্তম যখন সাহাবী রিবয়ী বিন আমের রাযিআল্লাহু আনহুকে বলে, তোমরা কেন এসেছো? তখন রিবয়ী বলেন, "আমরা আল্লাহর আদেশে বের হয়েছি- মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে বের করে আনার জন্য এবং সকল ধর্মের যুলুম-অত্যাচারমূলক বিধান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদল ও ইনসাফভিত্তিক বিধি-বিধানের ছায়াতলে নিয়ে আসার জন্য" ***তখন রুস্তম চিন্তাভাবনার জন্য সময় চায়। রিবয়ী বলেন, ঠিক আছে, কতদিন সময় চান, একদিন না দুদিন?!! রুস্তম বলে, না, আমাদের নেতৃবর্গের নিকট চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে আলাপ করা পর্যন্ত সময় চাই। রিবয়ী বলেন,***

ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل

"মোকাবেলার সময় শত্রুকে তিনদিনের বেশি সময় দেয়ার প্রচলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহয় নেই। সুতরাং তুমি ভেবে দেখো এবং তিনদিনের মধ্যে (ইসলাম, জিযিয়া বা তরবারী এই) তিনটির কোন একটি গ্রহণ করো।"
(আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৪০)

দ্বিতীয় পর্ব

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ

(মুজাহিদ বানানোর নিয়তে সন্তান কামনা)

আদনান মারুফ

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين كلهن، يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله، فرسانا أجمعون». صحيح البخاري (2819) وبوَّب عليه البخاري بقوله: »باب من طلب الولد للجهاد « قال الحافظ في فتح الباري (6/34 دار الفكر) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك). ووقال أيضا (10/580) : (ويقال إن طلحة قال للزبير: أسماء بني أسماء الأنبياء وأسماء بنيك أسماء الشهداء، فقال: أنا أرجو أن يكون بني شهداء، وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أنبياء، فأشار إلى أن الذي فعله أولى من الذي فعله طلحة)

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সুলাইমান বিন দাউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি একশো - অথবা বলেছেন, - নিরানব্বই জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো। তাদের প্রত্যেকেই একজন অশ্বারোহী প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তার সাথী (ফেরেশতা) বললেন, বলুন, ইনশাআল্লাহ! কিন্তু তিনি (ভুলে) ইনশাআল্লাহ বললেন না। ফলে একজন স্ত্রী ছাড়া কেউই গর্ভবতী হলেন না। তিনিও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে সকলের সন্তান হতো এবং তারা সকলেই ঘোড় সওয়ার হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো। -সহিহ বুখারী, ২৮১৯ (ইফা, ৪/১৩১)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে, "জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করা।"

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অর্থাৎ এই নিয়তে সহবাস করবে যেন সন্তান হয় এবং সে সন্তান আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহলে বাস্তবে তা না ঘটলেও সে সওয়াব পেয়ে যাবে। -ফাতহুল বারী, ৬/৩৪

> "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নপুংসক (খাসী) হতে নিষেধ করেছেন যেন কাফেরদের সাথে জিহাদ চলমান থাকে। কেননা যদি তিনি তাদের নপুংসক হওয়ার অনুমতি দিতেন তাহলে তারা একযোগে নপুংসক হওয়া শুরু করতেন, এতে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি কমে যেতো এবং কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতো।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমও সন্তান কামনা করতেন যেন তারা আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করে এবং শহিদ হয়। হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"বলা হয়, তলহা রাযিআল্লাহু আনহু যোবায়ের রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেন, আমার ছেলেদের নাম তো নবীদের নাম, আর আপনার ছেলেদের নাম হলো শহিদদের নাম। যোবায়ের বললেন, আমি আশা রাখি, আমার ছেলেরা শহিদ হবে, কিন্তু তুমি তো তোমার ছেলেদের নবী হওয়ার আশা করতে পার না। এ কথা বলে যোবায়ের ইশারা করেন, তার ছেলেদের নাম চয়ন তলহা রাযিআল্লাহু আনহুর ছেলেদের নাম চয়নের চেয়ে উত্তম হয়েছে।" -ফাতহুল বারী, ১০/৫৮০

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নিষেধ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে জিহাদের জন্য সেনা সরবরাহ। সাদ বিন ওয়াক্কাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل».»
(صحيح البخاري: (5073) صحيح مسلم: (1402

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান বিন মাযউন রাযিআল্লাহু আনহুকে বৈরাগ্যের অনুমতি দেননি।" -সহিহ বুখারী, ৫০৭৩ সহিহ মুসলিম, ১৪০২

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী, কিরমানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন,

التبتل أي: الانقطاع عن النساء، وكان ذلك من شريعة النصارى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أمته، ليكثر النسل ويدوم الجهاد).
عمدة القاري (20/ 72) الكواكب الدراري (19/ 61) مرقاة
(المفاتيح (5/2042) اللامع الصبيح (13/ 176

> **বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টধর্মে বৈধ ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বৈরাগ্য থেকে নিষেধ করেন, যেন তাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং জিহাদ সর্বদা চলমান থাকে।**

"বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টধর্মে বৈধ ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে বৈরাগ্য থেকে নিষেধ করেন, যেন তাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং জিহাদ সর্বদা চলমান থাকে।" -উমদাতুল কারী, ২০/৭২ আলকাওয়াকিবুদ দুরারী, ১৯/৬১ মেরকাত, ৫/২০৪২ আললামিউস সাবিহ, ১৩/১৭৬

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من
(البعثة المحمدية. فتح الباري لابن حجر (9/ 118

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নপুংসক (খাসী) হতে নিষেধ করেছেন যেন কাফেরদের সাথে জিহাদ চলমান থাকে।

কেননা যদি তিনি তাদের নপুংসক হওয়ার অনুমতি দিতেন তাহলে তারা একযোগে নপুংসক হওয়া শুরু করতেন, এতে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি কমে যেতো এবং কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যেতো। আর এটা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।" -ফাতহুল বারী, ৯/১১৮

রাসূলকে নবীরূপে প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহ, যেন তাকে বিজয়ী করেন সকল ধর্মের উপর, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" -সূরা তাওবা, ৩৩

আর সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। সে সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইসলাম বেশি করে বিবাহ করার ও অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু সাইদ বিন যোবায়ের রহিমাহুল্লাহুকে বলেন,

«تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء

"তুমি বিবাহ করে নাও, কেননা এই উম্মতের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তার স্ত্রীর সংখ্যাও ছিল সবচেয়ে বেশি।" -সহিহ বুখারী, ৫০৬৯ মুসনাদে আহমদ বিন

মানী'র বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস যখন সাইদ বিন যোবায়েরকে এ কথা বলেছিলেন, তখন তার দাড়িও ওঠেনি। -ফাতহুল বারী, ৯/১১৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

তোমরা প্রেমময়ী অধিক সন্তান জন্মদানকারী মেয়েদের বিয়ে করো, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সাথে গর্ব করবো। -সুনানে আবু দাউদ, ২০৫০ সুনানে নাসায়ী, ৩২২৭

উমর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قال عمر بن الخطاب : عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأنتج أرحاما وأرضى باليسير.

তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে করো, কেননা তাদের মুখ সুমিষ্ট এবং তারা অধিকহারে সন্তান জন্ম দেয়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ১৭৯৯০

হিটলার যখন পুরো বিশ্ব দখল করার ইচ্ছা করে তখন সে বুঝতে পারে এর জন্য প্রচুর জার্মান সৈন্য লাগবে। তাই সে আইন করে দেয়, মেয়েরা মেট্রিকের পরে আর পড়ালেখা করবে না। বরং তারা সন্তান জন্মদানের জন্য বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর বিয়েতে সহায়তার জন্য সরকার ঋণপ্রদান করবে, যদি একবছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দিতে পারে তবে ঋণের এক-চতুর্থাংশ মাফ করে দেয়া হবে, দ্বিতীয় বছরও সন্তান জন্ম দান করলে অর্ধেক মাফ করে দেয়া হবে। (কাশকুলে মারেফাত, মুফতি শফী রহিমাহুল্লাহ) হিটলারের উদ্দেশ্যে ছিলো করে পুরো পৃথিবী দখল করে নাৎসীবাদ বা জার্মান জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ জার্মানরা হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই তারা পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে আর অন্যরা তাদের গোলামী করবে। নিঃসন্দেহে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত উদ্দেশ্য ছিল। তবে আমার মনে হয় তার উদ্দেশ্য খারাপ হলেও পদ্ধতিটা ঠিকই ছিল।

হিটলার যখন পুরো বিশ্ব দখল করার ইচ্ছা করে তখন সে বুঝতে পারে এর জন্য প্রচুর জার্মান সৈন্য লাগবে। তাই সে আইন করে দেয়, মেয়েরা মেট্রিকের পরে আর পড়ালেখা করবে না। বরং তারা সন্তান জন্মদানের জন্য বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর বিয়েতে সহায়তার জন্য সরকার ঋণপ্রদান করবে, যদি একবছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দিতে পারে তবে ঋণের এক-চতুর্থাংশ মাফ করে দেয়া হবে, দ্বিতীয় বছরও সন্তান জন্ম দান করলে অর্ধেক মাফ করে দেয়া হবে।

আমরাও পুরো পৃথিবী দখল করতে চাই তবে তা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। কাফেরদের জিহাদ, জিযিয়া ও গোলাম বাদী বানানোর মাধ্যমে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আমাদেরও প্রচুর সৈন্য লাগবে। এজন্য ইসলাম অধিকহারে সন্তান নেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে যদিও আদমশুমারীতে মুসলিমের সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাদের অনেকেই কার্যত জিহাদ বিরোধী। তাই মুসলমানদের মাঝে জিহাদের দাওয়াত ও প্রচারণার পাশাপাশি আমরা নিজেরাও অধিকহারে সন্তান নেয়ার ফিকির করবো ইনশাআল্লাহ।

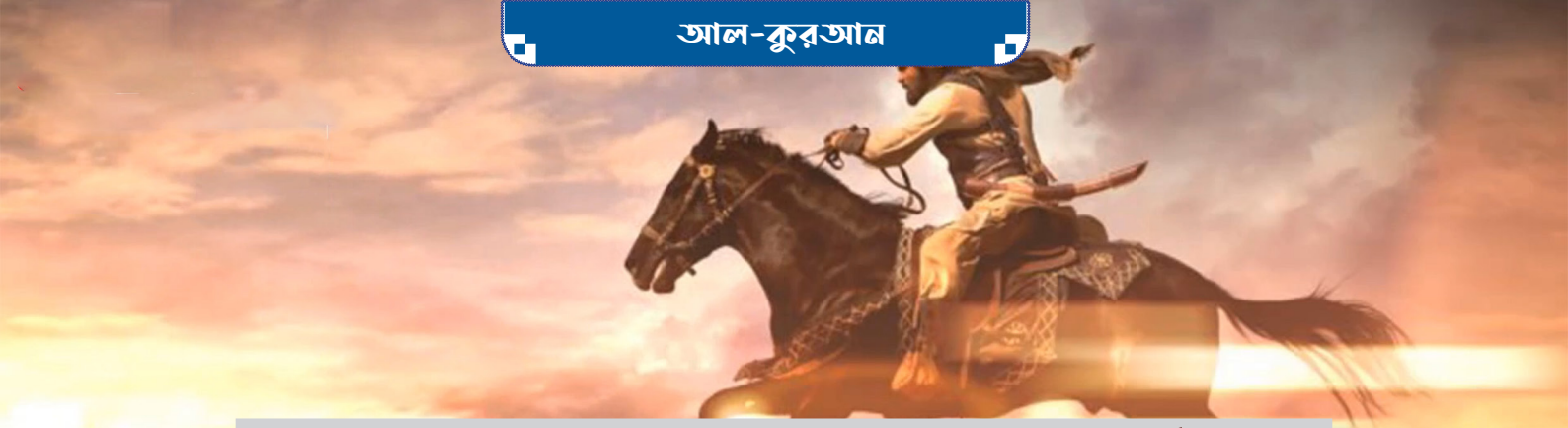

(জিহাদের আসবাবের প্রতি ভালোবাসা, তার পরিচর্যা এবং একে আল্লাহ তায়ালার যিকিরের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা)

তৃতীয় পর্ব

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং জিহাদ

আদনান মারুফ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

"আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলা তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল। তখন সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেল। (অনন্তর সে বললো,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলো।" -সূরা সোয়াদ, ৩০-৩৩ তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৯৩-১৯৪

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন, "সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তো এগুলোকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি, এগুলো তো সংগ্রহই করা হয়েছে জিহাদের জন্য। আর জিহাদ করা হয় আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসায়। অতঃপর ঘোড়াগুলো এগুতে এগুতে তার চোখের আড়ালে চলে গেল। তিনি সেগুলোকে আবারও তার সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে আদর বুলিয়ে দিলেন। আয়াতের উপরিউক্ত তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে এবং এটা আয়াতের শব্দাবলীরও বেশি কাছাকাছি। ইবনে জারীর ও ইমাম রাযী রহিমাহুমাল্লাহ এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।" তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৯৪

শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহও আয়াতের এরকম অর্থই করেছেন। তার তরজমার টীকায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"অর্থাৎ জিহাদের ঘোড়ার ভালোবাসা ও পরিচর্যাও তো আল্লাহ তায়ালার স্মরণের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করা তাই জিহাদের হাতিয়ার ও আসবাবও নিশ্চিতভাবে আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্লাহ তায়ালা জিহাদ এবং জিহাদের হাতিয়ার প্রস্তুত করার আদেশ না দিতেন তবে এই ঘোড়াকে আমরা এত ভালোবাসতাম না। এই জিহাদের জযবার আতিশয্যে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, ঘোড়াগুলো পুনরায় নিয়ে আসো। ঘোড়াগুলো ফিরিয়ে আনা হলে সুলাইমান আলাইহিস সালাম অত্যন্ত ভালোবাসা ও আদরের সাথে সেগুলোর গর্দান ও পায়ের গোছায় হাত বুলিয়ে তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আয়াতের এ ব্যাখ্যা কোন কোন মুফাসসির করেছেন, আয়াতে উল্লিখিত خير (কল্যাণ) শব্দ থেকে এর সমর্থন মেলে, যেন এ শব্দটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এই হাদিসের বিষয়বস্তুর দিকে ইশারা করছে, "ঘোড়ার কেশরে কিয়ামত পর্যন্ত خير (কল্যাণ) যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।" (তাফসীরে উসমানী)

আল-জিহাদ

আমদের না হয় বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু আল্লাহকে কি বুঝাবেন???

ফরায়েজি

ইয়া আল্লাহ আপনার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি সেই সৃষ্টিকূলের সাথে যারা প্রতিনিয়ত আপনারই প্রশংসা করে যাচ্ছে, আপনার ই তাসবিহ পাঠ করে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের উপরে বড়ই অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমরা নিজেদের উপরে বড়ই জুলুম করেছি।

দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের উপর। তথাকথিত এক শ্রেণীর [আলিম দাবীকৃত] কিছু ব্যক্তিদের থেকে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় - ইসলামে গুপ্ত হত্যা হারাম, নিষিদ্ধ। এই কথার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন রকম দলিল দেয়ার চেষ্টা করেন যেগুলোর কোনটাই প্রাসঙ্গিক না আর যথার্থ তো অবশ্যই না! আমি এটাকে বলি, আশে পাশে কোপানো। অর্থাৎ জেনে বুঝে এমন কথা বলতে থাকা এমন কাজ করতে থাকে যে উপস্থিত সাধারণ মানুষ মনে করবে মা শা আল্লাহ কতবড় ফকিহ! ব্যাখ্যা দেখেছো নাকি! কই কই ঘুরে আসলো! আমাদের অজ্ঞতার কারণে, আমরা হক্কপন্থী সহিহ আলিমদের কাছে আসা যাওয়া ছেড়ে দেয়ার কারণে আমাদের সামনে উনারা যেমন ইচ্ছা তেমন লাউ কদু দেখাতে থাকেন!

মূল কথায় ফিরে আসি, ইসলামে গুপ্ত হত্যা হারাম, নিষিদ্ধ। এই কথাটি মিথ্যা কথা, শুধু মিথ্যা ই নয় বরং রাসুল সাঃ এর সিরাহকে, রাসুল সাঃ পবিত্র কাজকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করা। কিভাবে? কারণ রাসুল সাঃ এর পবিত্র সীরাহতে রাসুল সাঃ এর পবিত্র কাজের মধ্যেই আমরা গুপ্ত হত্যার বিষয়টি দেখতে পাই। সহিহ বুখারী এবং মুসলিমের হাদিসে আমরা কাব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে কে হত্যা করার বর্ণনা পাই।

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «من لكعب بن حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا، والله لتملنه. قال: أنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم، ارهنوني. قلت: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، قال سفيان: يعني السلاح، فواعده أن يأتيه ليلا، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة، ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنه بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني مائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمر، وقال: عندي أعطر نساء العرب، وأجمل العرب. قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه، ثم أشَمَّ أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বললেন, হ্যাঁ বল।

এরপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি [রাসূল (সা:)] ছাদাক্বা চায় এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি।

কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম! পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, ধার তো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ বললেন, আপনি আরবের একজন সুদর্শন ব্যক্তি। আপনার নিকট কিভাবে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। শেষে তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন।

এরপর তিনি কা'ব ইবনু আশরাফের দুধ ভাই আবূ নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দূর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবূ নায়েলা এসেছে। 'আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবূ নায়েলা (অপরিচিত কোন লোক তো নয়)। ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফইয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। 'আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইবনু আশরাফ) আসবে। 'আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে, (তারা হ'লেন) আবূ আবস্ ইবনু জাবর, হারিছ ইবনু আওস এবং আববাদ ইবনু বিশর। 'আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা

একদা রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা:) বললেন, হ্যাঁ বল।

আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নীচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। 'আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। 'আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, 'আমাকে আবার শুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী (সা:)-এর নিকট এসে এ খবর দিলেন।

[বুখারী হা/৪০৩৭ 'মাগাযী' অধ্যায়, 'কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা']

কিতাবুল মাগাজির বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من الداخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا أبا رافع قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أنتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد أنتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال (ابسط رجلك) . فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط

"হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত। সে (খায়বারের কাছাকাছি) হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গে বাস করত। সাহাবায়ে কেরাম যখন তার দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন তাদের পশুগুলোকে চারণভূমি থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের বললেন, তোমারা এখানেই বসে থাক। আমি যাই। দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল করে ঢুকতে পারি কি'না দেখি।

হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত।

তিনি দরজার কাছে পৌঁছলেন। পৌঁছে কাপড় মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে গেলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। এতক্ষণে লোকজন দূর্গে ঢুকে গেছে। দারোয়ান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে ঢুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি। আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকে (আস্তাবলে) লুকিয়ে গেলাম। সবার ঢুকা শেষ হলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। চাবিগুলো একটি পেরেকে লটকিয়ে রাখল।

তিনি বলেন, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম। দরজা খুললাম। আবু রাফের অভ্যাস ছিল, রাতে তার কাছে খোশ-গল্পের আসর বসত। সে দূর্গের উপরের তলায় থাকত। তার গল্পের সঙ্গীরা যখন চলে গেল, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলতাম, ভিতর থেকে লাগিয়ে দিতাম; এই ভেবে যে, যদি লোকজন আমার ব্যাপারে টের পেয়ে যায়, তাহলে হত্যা করে শেষ করা পর্যন্ত যেন তারা আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি তার কক্ষে পৌঁছলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি গিয়ে আবু রাফেকে ডাক দেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তিনি জওয়াব দেন, আমি আবু রাফের জন্য একটু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এতে স্ত্রী দরজা খোলে দেয়।) সে অন্ধকার কক্ষে তার পরিবারের লোকদের মাঝখানে শুয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে, ঠিক কোথায় সে। ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে জওয়াব দিল, এই লোক কে? আমি আওয়াজটা লক্ষ করে তরবারি চালালাম। আমার তখন দিশেহারার মতো অবস্থা। কিন্তু না! কোন কাজ হল না। উল্টো সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার গেলাম। (গলার স্বর পরিবর্তন করে যেন আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছি এই ভান করে) বললাম, 'আবু রাফে! আওয়াজ কিসের'? সে উত্তর দিল, 'তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! এই মাত্র কক্ষে এক ব্যক্তি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে'। তিনি বলেন, এবার আরেকটা কোপ দিলাম। এতে সে মারাত্মক জখম হল। কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না। এরপর আমি তরবারির ধারালো দিকটা তার পেটের উপর ধরে সজোরে চাপ দিলাম। একেবারে পিটে গিয়ে ঠেকল। বুঝতে পারলাম, হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর একেক করে দরজাগুলো খুলতে লাগলাম। আসতে আসতে একটা সিঁড়িতে এসে পা রাখলাম। (আমি চোখে একটু কম দেখতাম।) রাত ছিল চাঁদনী। মনে করেছি (সব সিঁড়ি শেষ) নিচে এসে গেছি। (কিন্তু তখনও একটি সিঁড়ি বাকি ছিল)। আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। পাগড়ি খোলে পা বেঁধে নিলাম। সেখান থেকে এসে দরজার নিকট বসে রইলাম। বললাম, হত্যা করতে পেরেছি কি'না তা না জানা পর্যন্ত আজ রাতে আর বের হচ্ছি না। যখন (ভোর হল এবং) মোরগ ডাকতে লাগল, তখন ঘোষক প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা দিল, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে মারা গেছে'।

ঘোষণা শুনে (নিশ্চিত হয়ে) আমার সঙ্গীদের নিকট এলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি পালাও। আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। (এরপর আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম আর রাতের বেলা পথ চলতাম। এভাবে খায়বার থেকে মদীনায় উপস্থিত হলাম।) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তোমার পা এদিকে বাড়াও দেখি। পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমনভাবে ভাল হয়ে গেলাম, যেন কখনও কোন ব্যথাই পাইনি।"

- সহীহ বুখারি: ৩৮১৩, কিতাবুল মাগাজি।

লক্ষ্য করুন প্রথম হাদিসে "মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাঃ রাসুল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" রাসুল সাঃ হ্যাঁ বলেছেন, রাসুল সাঃ এই গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে হ্যাঁ বলেছেন। এর পরের হাদিসে আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন।

এরপরেও যখন বলা হয় ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ তখন এর দ্বারা তারা কি প্রমাণ করতে চান? আমরা নিজে থেকে কিছু বানাইনি আর রাসুল সাঃ আমাদের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ করে যাননি তাহলে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন – "ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ" এ দ্বারা আপনারা আমাদের কি বুঝাতে চান?

এরপরেও যখন বলা হয় ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ তখন এর দ্বারা তারা কি প্রমাণ করতে চান? আমরা নিজে থেকে কিছু বানাইনি আর রাসুল সাঃ আমাদের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ করে যাননি তাহলে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন – "ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ" এ দ্বারা আপনারা আমাদের কি বুঝাতে চান?

বর্তমান সময়ে ড্রোন হামলার কথা জানেনা এমন মানুষ খুব কমই আছে। প্রতিনিয়ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, লিবিয়া এমন মুসলিম দেশগুলোতে ড্রোন হামলায় হাজার হাজার নিরীহ মুসলিম নারী পুরুষ শিশু নিহত হচ্ছে! হতেই থাকছে। আজ পর্যন্ত কেউ এই ড্রোন হামলা নিয়ে কোন কথা বলেনা। ড্রোন হামলার ৯০% টার্গেট হচ্ছে নিরীহ জনগণ, যার মধ্যে আছে নারী পুরুষ এমনকি অসহায় শিশু! আমি যা বললাম শুধু মাত্র এই একটি লাইন বিশ্ব মিডিয়ার শিরোনাম হয়ে এসেছে। এভাবে বললেও মিথ্যা হবেনা যে, অ্যামেরিকার এই ভয়ঙ্কর খেলার শিকার হচ্ছে - ৯০% নিরীহ মানুষ!

শুধুমাত্র পাকিস্তানে ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ২৫৩৭ থেকে ৩৬৪৬ এবং আহতের সংখ্যা - ১১২৮ থেকে ১৫৫৭ জন। এর মধ্যে - শিশুর সংখ্যা ২০০। সাধারণ নাগরিক - ৪১৬ থেকে ৯৫১। এবং অজানা - ১৯০৪ থেকে ২৪৪৬। অজানা অর্থ হচ্ছে - এই নিহতদের দেহ এমন পর্যায়ে বিকৃত বা ধ্বংস হয়ে গেছে যে তা বুঝার কোন উপায় নেই, তারা কে, বা কেমন? আর সমস্ত আহত নিহতের মধ্যে তাদের দাবীকৃত টার্গেট ছিলো মাত্র ৪৯ জন! এ তো জানলেন শুধুমাত্র পাকিস্তানের ঘটনা। এবার আফগানিস্তানের ব্যাপারেও জেনে নিন। শুধুমাত্র ২০১৯ সালে আফগানিস্তানে সর্বমোট ৬৮২৫ টি ড্রোন স্ট্রাইক চালানো হয়েছে! তাহলে পাকিস্তানের হিসাব থেকে আফগানিস্তানের আহত নিহতের একটা ধারনা করে নেন! তাগুত আল সাউদ নির্বিচারে ইয়েমেনে অসহায় মুসলিম নারী শিশুদের পাইকারী হারে হত্যা করছে এ নিয়ে কেউ ফাতওয়া দেয়না! অথচ মুসলিমের রক্ত ঝরানো যে কত বড় পাপ তা কল্পনা করাও মুশকিল! কাফের মুরতাদ এবং রাসুল সাঃ এর অবমাননাকারী জাহান্নামের কীটদের গুপ্ত হত্যা করা হলে ইনারা খুব আহত হোন সাথে সাথে ইসলামের শান রক্ষার্থে বয়ান দেয়া শুরু করেন কিন্তু অপর দিকে যখন মুসলিম নামধারী এই তাগুত রা ইসলামের নাম নিশানাই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন তাদের মোটেও খুজে পাওয়া যায়না!

মনে রাখবেন, গুপ্ত হত্যা নিহত হয় খুব বেশী ১,২,৩ কিংবা ১০০ যারা কাফের কিংবা অধিকাংশই কাফের। আর তখন আপনাদের জবান খুলে যায়। অপর দিকে তগুতের জুলুমে নিহত হয় হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, শিশু এবং পুরুষ। তখন কেন আপনাদের আমরা খুঁজে পাইনা! আমাদের মত কানাকে হাইকোর্ট হয়ত দেখাতে পারবেন কিন্তু আস সামি ওয়াল বাসির কে পারবেন কি!

তাগুত আল সাউদ নির্বিচারে ইয়েমেনে অসহায় মুসলিম নারী শিশুদের পাইকারী হারে হত্যা করছে এ নিয়ে কেউ ফাতওয়া দেয়না! অথচ মুসলিমের রক্ত ঝরানো যে কত বড় পাপ তা কল্পনা করাও মুশকিল! কাফের মুরতাদ এবং রাসুল সাঃ এর অবমাননাকারী জাহান্নামের কীটদের গুপ্ত হত্যা করা হলে ইনারা খুব আহত হোন সাথে সাথে ইসলামের শান রক্ষার্থে বয়ান দেয়া শুরু করেন কিন্তু অপর দিকে যখন মুসলিম নামধারী এই তাগুত রা ইসলামের নাম নিশানাই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন তাদের মোটেও খুজে পাওয়া যায়না! মনে রাখবেন, গুপ্ত হত্যা নিহত হয় খুব বেশী ১,২,৩ কিংবা ১০০ যারা কাফের কিংবা অধিকাংশই কাফের। আর তখন আপনাদের জবান খুলে যায়। অপর দিকে তগুতের জুলুমে নিহত হয় হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, শিশু এবং পুরুষ। তখন কেন আপনাদের আমরা খুঁজে পাইনা! আমাদের মত কানাকে হাইকোর্ট হয়ত দেখাতে পারবেন কিন্তু আস সামি ওয়াল বাসির কে পারবেন কি!

পঞ্চম পর্ব

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

আদনান মারুফ

যেহেতু ইসলামে দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হলো- তাদেরকে মুসলমানদের সংস্পর্শে রেখে ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদের সাথে সদাচারের প্রতি খুব বেশী উৎসাহিত করেছেন, এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মনিব নিজে যে মানের খাবার খায় গোলামকেও সেই মানের খাবার খাওয়াতে বলেছেন। মনিব নিজে যে ধরণের পোশাক পরে তাকেও সেই ধরণের পোশাক সরবরাহ করার আদেশ দিয়েছেন। -সহিহ বুখারী, ৩০ সহিহ মুসলিম, ১৬৬১। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও বারংবার একথা বলছিলেন, الصلاة وما ملكت أيمانكم "তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং দাসদাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।" -সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬২৫

বলাবাহুল্য, মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে যখন বন্দী দাস-দাসীরা তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করবে, বিশেষকরে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে দেখবে, পাশাপাশি মুসলমানদের অধীনে থাকার দরুন ইসলাম গ্রহণে অন্য কোন বাধাও থাকবে না, তখন তারা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। সাহাবা-তাবেয়ীগণ যে কাফেরদের বন্দী করে এনেছেন তারা প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। বরং তাঁরা নিজেরা কিংবা তাদের সন্তানরা বড় বড় আলেম-সেনাপতি-আমির হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। যদি এদেরকে গোলাম-বাঁদী না বানানো হতো তাহলে হয়তো তারা সারাজীবন কাফেরই থেকে যেতো।

এখন ভাবার বিষয় হলো দুটোর মধ্য কোনটা উত্তম:-
১:- ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি সহ্য করা। বিনিময়ে মুমিন হয়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের সফলতা লাভ।

২:- দুনিয়াতে গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি হতে বেঁচে থাকা, বিনিময়ে আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করা। যে ব্যক্তি নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাফেরদের নিকট গচ্ছিত রাখেনি তার বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, প্রথমটির সাথে দ্বিতীয়টার কোন তুলনাই চলে না। শায়েখ আনোয়ার আওলাকীর ভাষায়, "যদি আমার পূর্বপুরুষকে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি. গোলাম বানিয়ে তার দ্বারা নিজের জুতোও পরিষ্কার করিয়ে থাকেন, তবুও তাতে আমি খুশি, কেননা এটা তার জন্য কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে ভালো।"

তবে যেহেতু দাস-দাসী বানানো হলো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম, তাই ইসলাম চায় না দাস-দাসীরা চিরকাল দাস-দাসী হিসেবেই জীবনযাপন করুক, এজন্য ইসলামে দাস মুক্তির (বিশেষ করে মুসলিম দাস মুক্তির) বহু ফযীলত ও বিধান রয়েছে। হাদিসে এসেছে, "যে ব্যক্তি কোন মুমিন দাসকে আযাদ করবে তো দাসের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।"-সহিহ বুখারী ২৫১৭, সহিহ মুসলিম ১৫০৯। সহিহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, "এ হাদিস শুনে আলী বিন হুসাইন রহ. দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদকৃত একটি দাসকে আযাদ করে দেন।" -সহিহ বুখারী - ২৫১৭

যে ব্যক্তি দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার পরে আযাদ করে বিয়ে করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াবের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। -সহিহ বুখারী - ৯৭, সহিহ মুসলিম – ১৫৪।

দাসী যদি মনিবের ঔরসে সন্তান জন্মদান করে তবে সে মনিবের মৃত্যুর পরে আযাদ হয়ে যায়।
- সুনানে ইবনে মাজাহ - ২৫১৬, মুসনাদে আহমদ – ২৭৫৯।

দাসদাসীরা যদি মুকাতাবাত তথা বিনিময় প্রদানের শর্তে আযাদ হওয়ার চুক্তি করতে চায় তবে মনিবদেরকে এ চুক্তি মঞ্জুর করার আদেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মনিব ও অন্যান্য মুসলমানদের এই চুক্তির বিনিময় আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। বরং এটাকে যাকাতের একটি মাসরাফ-খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
-সুরা নুর - ২৪, সুরা তাওবা ৬০।

তেমনিভাবে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ দাস আযাদ করার আদেশ করা হয়েছে। যেমন:-

ক. কেউ যদি কোন মুসলমানকে ভুলে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার অপরাধের কাফফারা হলো একটি মুসলিম দাস আযাদ করা, দাস আযাদ করার সামর্থ্য না থাকলে দুইমাস লাগাতার রোযা রাখা।
-সুরা নিসা, ৯২

খ. কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করলে অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলেও তার কাফফারা হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা।
-সুরা মুজাদালা, ৩

গ. কেউ যদি রমযান মাসে ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাফফারাও হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। সহিহ বুখারী, ১৯৩৬ সহিহ মুসলিম,

হাদিসে এসেছে, "কেউ যদি দাসকে থাপ্পড় মারে কিংবা প্রহার করে তো এর কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেওয়া।"
-সহিহ মুসলিম, ১৬৫৭

উল্লিখিত হাদিসসমূহের কারণে সাহাবায়ে কেরাম ব্যাপক পরিমাণে দাস আযাদ করতেন, বিশেষকরে দাসদের ইসলাম গ্রহণের পর। মুয়াজ রাযি. একবার কিছু ক্রীতদাস হাদিয়া পান। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে তারা পিছনে ইক্তেদা করতে আসে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কার জন্য নামায পড়ো? তারা বলে, আল্লাহর জন্য। এ কথা শুনে মুয়াজ বললেন, তবে যাও তোমরাও আল্লাহর জন্য (আযাদ)।
-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ২২৩৯৩

প্রসিদ্ধ সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআ রাযি. মৃত্যুর সময় তার দাস-দাসীদের মধ্যে যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে তাদের আযাদ করে দেয়ার ওসিয়্যত করে যান। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক,

সারকথা হলো, দাসপ্রথার মাধ্যমে ইসলাম কাফেরদের মুসলমান বানানোর জন্য একটি পরিপূর্ণ নেযাম বা সিস্টেম তৈরি করেছে, যার সূচনা হবে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে দাস বানানোর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি হবে তাদেরকে আযাদ করা -বিশেষকরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে- আযাদ করার মাধ্যমে। আর মাঝখানে তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদাচার করা হবে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। উল্লিখিত হাদিসগুলোর সমষ্টি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে ভুল ধারণা তৈরির কারণ হলো, অনেকেই শুধু দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার কিংবা তাদেরকে আযাদ করার প্রতি উৎসাহিত করার হাদিসগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু কাফেরদের দাস-দাসী বানানোর প্রতিও যে একাধিক হাদিসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এড়িয়ে যায়, আর এভাবেই এ ব্যাপারে তাদের একটা খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাফেরদের মুসলিম বানানোই ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হয় তবে ইসলাম গ্রহণকেই কেন তাদের মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো না? কেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা আযাদ হয়ে যাবে না? এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে, আমার মতে এর সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকেই দাসমুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা অনেকটা ঘাড়ে তলোয়ার ধরে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর মতোই হতো।

কেননা দাসত্ব এতই ঘৃণিত বিষয় যে, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দাসত্বের জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তাই যদি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই দাসরা আযাদ হয়ে যেতো, তবে ইসলাম সম্পর্কে অবগতির পূর্বেই দাসেরা শুধু মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করতো। এরপর হয়তো তারা পালিয়ে কাফেরদের কাছে চলে যেতো কিংবা মুনাফিক হয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে আমাদের ক্ষতিসাধন করতো। ফলে দাসপ্রথা বহাল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিছুদিন দাস হিসেবে মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভের পাশাপাশি তাদের সাথে মুসলিমদের উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করে আন্তরিকভাবে মুসলমান হওয়া- এ লক্ষ্য অধরাই রয়ে যেতো।

“সারকথা হলো, দাসপ্রথার মাধ্যমে ইসলাম কাফেরদের মুসলমান বানানোর জন্য একটি পরিপূর্ণ নেযাম বা সিস্টেম তৈরি করেছে, যার সূচনা হবে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করে দাস বানানোর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি হবে তাদেরকে আযাদ করা -বিশেষকরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে- আযাদ করার মাধ্যমে। আর মাঝখানে তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদাচার করা হবে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। উল্লিখিত হাদিসগুলোর সমষ্টি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে ভুল ধারণা তৈরির কারণ হলো, অনেকেই শুধু দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার কিংবা তাদেরকে আযাদ করার প্রতি উৎসাহিত করার হাদিসগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু কাফেরদের দাস-দাসী বানানোর প্রতিও যে একাধিক হাদিসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এড়িয়ে যায়, আর এভাবেই এ ব্যাপারে তাদের একটা খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাফেরদের মুসলিম বানানোই ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার প্রধান কারণ হয় তবে ইসলাম গ্রহণকেই কেন তাদের মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো না? কেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা আযাদ হয়ে যাবে না? এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর হতে পারে, আমার মতে এর সবচেয়ে সুন্দর উত্তর হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকেই দাসমুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা অনেকটা ঘাড়ে তলোয়ার ধরে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর মতোই হতো।”

শেষ পর্ব

ইসলাম প্রচারে তরবারীর ভূমিকা

আদনান মারুফ

আমরা প্রবন্ধের একদম শেষদিকে চলে এসেছি। পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, 'তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি' কথাটি আমাদের চূড়ান্ত দুশমন কাফেরদের একটি ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য। একটি অর্থের বিচারে কথাটিকে সঠিক বলা গেলেও তারা সে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেনি। তারা ঢালাওভাবে ইসলাম প্রচারে তরবারীর যে কোনো ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে। তাদের এই শ্লোগান প্রচারের পর থেকে যেসব ফলাফল আমাদের সামনে এসেছে সেগুলো দেখলেই বিবেকবান সকলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এই কথাটি প্রচারিত হবার পর তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অন্যতম ফরয বিধান ইকদামী জিহাদকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং ইকদামী জিহাদকে অস্বীকার করতে গিয়ে অস্বীকারকারীরা সাহাবায়ে কেরামকেও কালিমাযুক্ত করে ছেড়েছে। সাহাবাদের মত মহান চরিত্রের ব্যক্তিদের চরিত্রের উপর আঘাত হানতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ইকদামী জিহাদ অস্বীকারকারীদের তালিকা দিচ্ছি না। দিলে পাঠক বুঝতে পারতেন এ জালে কত তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরাও ফেঁসে গেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি, 'ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়নি' এটা ঢাহা মিথ্যা কথা। বরং ইসলাম প্রচারে তরবারীর গুরুত্ব অপরিসীম। জিহাদপ্রেমী এক আলেমকে এক শাগরেদ প্রশ্ন করে, ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে না আখলাকের মাধ্যমে? শাগরেদকে অবাক করে দিয়ে তিনি উত্তর দেন, "ইসলাম তো তরবারীওয়ালা

জিহাদপ্রেমী এক আলেমকে এক শাগরেদ প্রশ্ন করে, ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে না আখলাকের মাধ্যমে? শাগরেদকে অবাক করে দিয়ে তিনি উত্তর দেন, "ইসলাম তো তরবারীওয়ালা আখলাকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।" আসলে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে আজকে সব আলেম মিলে তরবারীকে আখলাকের বিপরীত মেরুতে দাড় করিয়ে দিচ্ছেন, তো আগামীকাল যখন কোন নাস্তিক-মুরতাদ কিতাবের পাতা উল্টে দেখিয়ে দিবে, রাসূল বলছেন, "আমি যোদ্ধা নবী;" "আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;" আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ইমান আনে;" (সহিহ বুখারী, ২৫ সহিহ মুসলিম, ২০ শামায়েলে তিরমিযি, ৩০৩ মুসনাদে আহমদ ৫১১৪)

আখলাকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।" আসলে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে আজকে সব আলেম মিলে তরবারীকে আখলাকের বিপরীত মেরুতে দাড় করিয়ে দিচ্ছেন, তো আগামীকাল যখন কোন নাস্তিক-মুরতাদ কিতাবের পাতা উল্টে দেখিয়ে দিবে, রাসূল বলছেন, "আমি যোদ্ধা নবী;" "আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;" আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ইমান আনে;" (সহিহ বুখারী, ২৫ সহিহ মুসলিম, ২০ শামায়েলে তিরমিযি, ৩০৩ মুসনাদে আহমদ ৫১১৪)

তো এই হাদিসগুলোর জবাবে মুহতারাম আলেমগণ কি বলবেন? তখন কি এই তাঁরাই মানুষের বেইমান-মুরতাদ হওয়ার কারণ হবেন না? পরিশেষে বলবো, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তাকে হাকিম-আলিম মহাপ্রজ্ঞাবান-মহাজ্ঞানী বলে বিশ্বাস করে তার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর বিধানের হিকমত বুঝে আসুক বা না আসুক, তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়া। কুরআন মুমিনদের কাছে এ দাবীই করেছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (سورة الأحزاب: 36)

"আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।" -সূরা আহযাব, ৩৬

বরং এর বিপরীত করাকে কুফর গণ্য করেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"না, (হে নবী) তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।" - সুরা নিসা, ৬৫

সুতরাং যদি আমাদের ধ্যানধারণা এমনই হয় যে, আল্লাহ তায়ালার বিধান বুঝে এলে মানবো না হলে মানবো না, ভালো লাগলে মানবো অন্যথায় নয়, তাহলে আমরা মুমিন হতে পারবো না। আর বাস্তবতা হলো যদি আমরা দুনিয়াবী সব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে আমাদের পুরো জীবন আল্লাহ তায়ালার বিধানাবলীর হিকমত অনুধাবনে ব্যয় করি তবুও আমাদের সীমিত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সব বিধানের পূর্ণ হিকমত বুঝা সম্ভব না। এজন্যই যখন মক্কার কাফেররা সুদ হারাম হওয়ার বিধানের প্রতি আপত্তি করে বলেছিল, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে) তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের জবাবে ব্যবসার উপকারিতা এবং সুদের ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরেননি। বরং তাদের জবাবে শুধু এটাই বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" সূরা বাকারা, ২৭৫

ব্যাস, যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকে, তবে তার আদেশ-নিষেধই যথেষ্ট। লাভ-ক্ষতি বিবেচনা ও হিকমত অনুধাবন জরুরী নয়। আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

"প্রকৃত ব্যাপার হলো- আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনও না কোনও হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তার হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মুলতবী রাখা, যা কোনও মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।" -তাওযীহুল কুরআন, ১/১৬২

রাসূল বলছেন, "আমি যোদ্ধা নবী;" "আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;" আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধের আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা ইমান আনে;" (সহিহ বুখারী, ২৫ সহিহ মুসলিম, ২০

তাই আসুন শয়তানের সৃষ্ট সকল যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে উঠে এবং কাফেরদের তৈরি মানবতার তথাকথিত মূল্যবোধ ত্যাগ করে, অসীম প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধানাবলীর সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, সাহাবায়ে কেরামের মহান আদর্শ سمعنا وأطعنا (আমরা আল্লাহর বিধান মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং খুশীমনে মেনে নিয়েছি -সুরা বাকারা, ২৮৫) এর বাস্তব অনুশীলন করি। এরপর যদি তা পালন করতে পারি তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যদি মানবীয় দুর্বলতাবশত কোন বিধান পালন করতে নাই পারি তবে অনুতপ্ত হই। এতে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু বুঝে না আসা বা পালন করা কষ্টকর হওয়ার কারণে তাঁর বিধানের উপর আপত্তি তোলা, কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহ তায়ালার বিধানই পাল্টে দেওয়া, যারা এ বিধান পালন করছে তাদের বাতিল আখ্যা দেয়া, এতো সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি, তবে এর সাথে নিচের লিংক থেকে শায়েখ আনোয়ার আওলাকির ভিডিওটা দেখে নিলে এ বিষয়ে আরো স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আমি যোদ্ধা নবী;"

"আমাকে তরবারী সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে;"

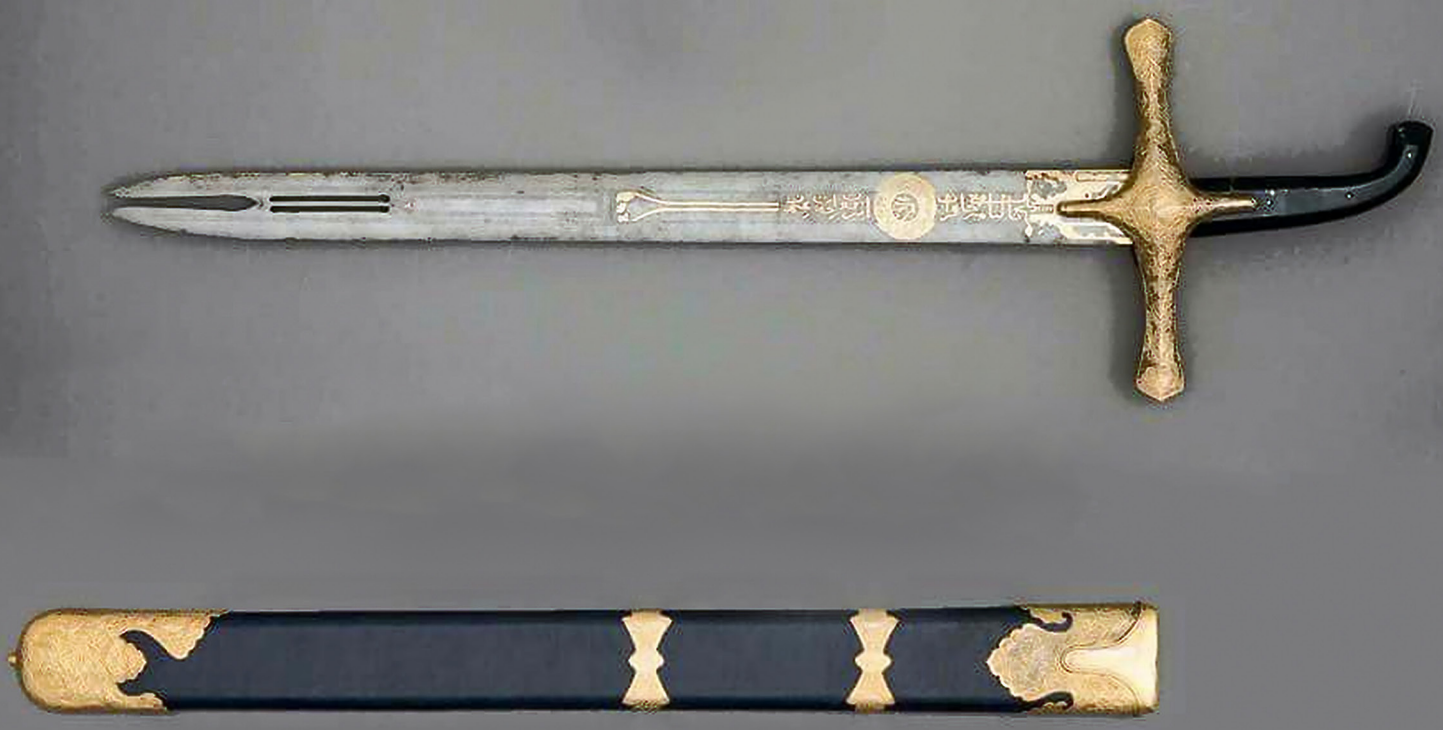

لا إله إلا الله محمد رسول الله

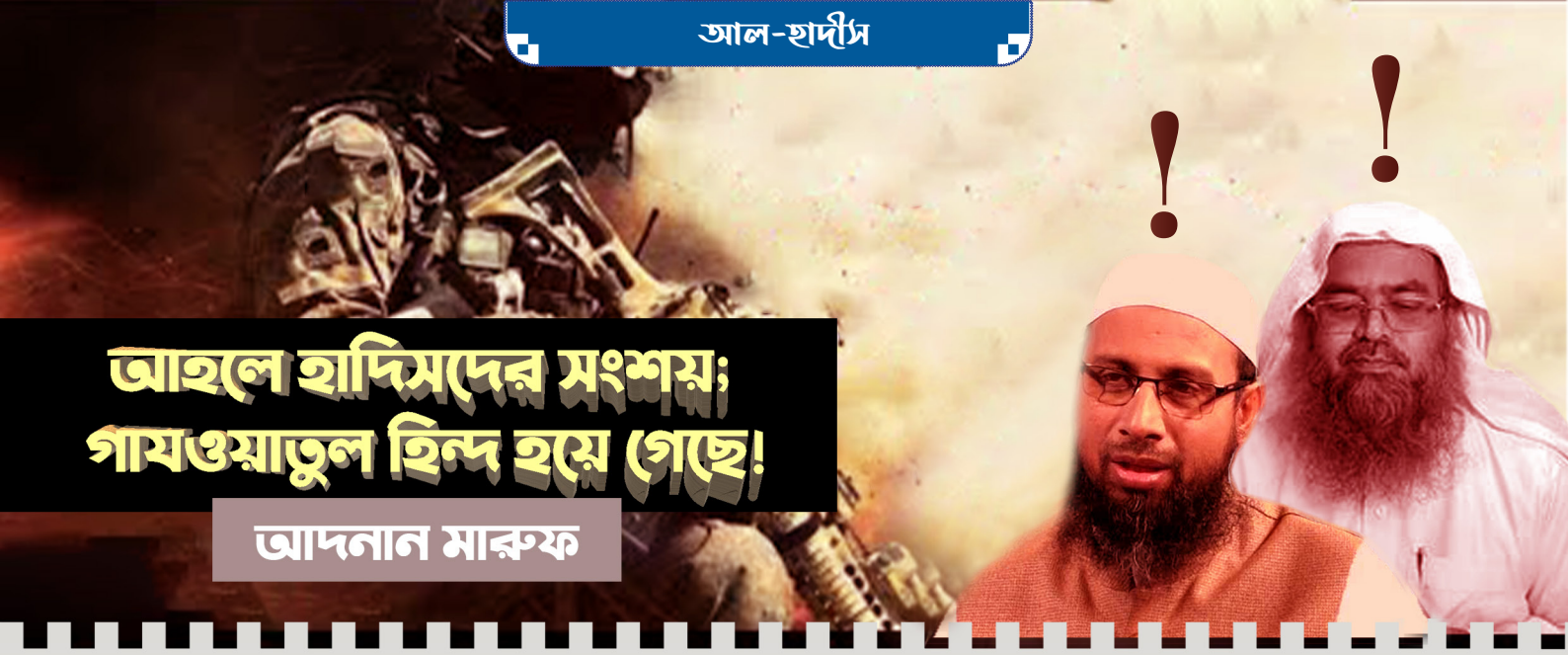

আহলে হাদিসদের সংশয়; গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে!

আদনান মারুফ

গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বর্তমান সমাজে একটি অনর্থক বিতর্ক রয়েছে। জিহাদ সমর্থক অনেক ভাই মনে করেন, হাদিসে বর্ণিত প্রতিশ্রুত গাযওয়ায়ে হিন্দ এখনো হয়নি, ভবিষ্যতে হবে। আর একে খণ্ডন করার জন্য হাদিস অনুসরণের দাবীদার কিছু লোক দাবী করে, গাযওয়ায়ে হিন্দ হয়ে গেছে। এটাই নাকি সত্যনিষ্ঠ আলেমদের মত। এমনকি বর্তমান আহলে হাদিসদের অন্যতম 'মান্যবর' ডক্টর মঞ্জুরে ইলাহি একধাপ আগে বেড়ে দাবী করে বসেছে, "গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে কোনো সহিহ হাদিস নেই, এ ব্যাপারে কিছু যয়ীফ হাদিসের সমাহার দেখা যায়। সুতরাং এ নিয়ে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই।" এই ধরণের ব্যক্তির ব্যাপারে কি-ইবা করা যাবে? এই লোক তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য দীনের স্বতঃসিদ্ধ ইজমায়ী সিদ্ধান্তকেও পাল্টে ফেলতে দ্বিধা করছে না।

শুধু তাই নয়, উলামায়ে কেরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্যও রয়েছে যে, কেউ শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। 'মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ'য় চারো মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাবাদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে,

أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نبي من الأنبياء، أو رسالة أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كذبه، أو سبه، أو استخف به، أو سخر منه، أو استهزأ بسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام (الموسوعة 22/210 ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت)

"আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি কোন একজন নবীর নবুওয়্যাতকে অস্বীকার করলে, তাকে মিথ্যাবাদী বললে, গালি দিলে, উপহাস করলে কিংবা আমাদের রাসূলের সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করলে সে কাফের হয়ে যাবে।" -মওসুয়্যাহ ফিকহিয়্যাহ, ২২/২১০

তাগুত হাসিনা যখন পর্দা নিয়ে ব্যাঙ্গ করে বলে, "এ কেমন জীবন্ত ট্যান্ট (তাঁবু) হয়ে ঘুরে বেড়ানো!" তখন মঞ্জুরে ইলাহি শেখ হাসিনাকে কুফরী থেকে বাঁচানোর জন্য বলে উঠে, "শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে উপহাস করা কবিরা গুনাহ, কুফর নয়। কুফর হলো, শরিয়তের কোনো বিধান অস্বীকার করা।" অথচ কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে, শরিয়তের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা করা কুফরি। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও ফূর্তি করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফূর্তি করছিলে? অজুহাত দেখিও না। তোমরা ইমান আনার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়েছো।" -সূরা তাওবা, ৬৫-৬৬

ভাবার বিষয় হলো, ইসলামী শরিয়তের এরকম সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও কেন তারা মুরতাদ শাসকদের বাঁচানোর জন্য দীনের অকাট্য বিধান পরিবর্তন করার পাঁয়তারা করে? এর উত্তর সেটাই যা আলোচ্য বক্তা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে আরোপ করেছে। সে বলেছে, "কিছু মানুষ শাসকদের তাকফির করে থাকে, তাদেরকে কাফের প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যেন এর মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়।" অথচ, বাহ্যত জ্ঞানী সেজে থাকা এই বোকা লোকটিও ভালো করেই জানে, শাসকদের কাফের বলে কেউ কোনো সুযোগ-সুবিধা পায় না। বরং শাসকদের কাফের বললে তো ওদের রোষানলে পড়তে হয়। হাদিসের সুস্পষ্টভাষ্য অনুযায়ী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুযোগ-সুবিধা কিছু পেলে তো এই নামস্বর্বস্ব ডক্টর ও শায়খরাই লাভ করে।

অন্যথায় শাসকদের হাজারো কুফরী প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা কোনো অবস্থাতেই ওদের তাকফীর করতে চায় না কেন? কারণ তো এটাই, যেন ওদের রোষানলে পুড়ে মরতে না হয়। রুটি-রোজগারের কোনো অভাব না হয়। শায়খ হামদ বিন নাসের আলফাহাদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু কতই না সুন্দর বলেছেন,

"শুনে রাখুন আমার মুসলিম ভাইয়েরা, অধিকাংশ আলিমরা দুঃখজনকভাবে তাকফিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মূলনীতি এতদিন জানতেন না, তা হল যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যা তাকে ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় – সে কখনো শাসকদের একজন হতে পারে না। কারণ শাসকরা যে কুফর বা শিরকই করুক না কেন, তাদের তাকফির করা হলে আকাশ ভেঙ্গে পড়া এবং পর্বতমালা ধ্বসে পড়ার মতো অবস্থা হবে। যাই হোক, গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদিসের তাহকীক পূর্বেও পেশ করা হয়েছে, আর সব আহলে হাদিস মঞ্জুরে ইলাহির মত বেপরোয়াও না। অধিকাংশ আহলে হাদিস আলেমরাই বলেন, গাযওয়ায়ে হিন্দের হাদিস সহিহ, তবে তা হয়ে গেছে। তাই আজকে এ ব্যাপারটাই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আসলে যারা মনে করেন গাযওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে আর যারা মনে করেন তা এখনো হয়নি, এই দুই শ্রেণীই ভুল ধারণার শিকার কারণ, হাদিসের শব্দ থেকে এটাই স্পষ্ট যে, হিন্দের কাফের-মুশরিকদের সাথে যত যুদ্ধ হবে সবই গাযওয়ায়ে হিন্দের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের শব্দ লক্ষ্য করুন,

> শাসকদের হাজারো কুফরী প্রকাশ পাওয়ার পরও তারা কোনো অবস্থাতেই ওদের তাকফীর করতে চায় না কেন? কারণ তো এটাই, যেন ওদের রোষানলে পুড়ে মরতে না হয়। রুটি-রোজগারের কোনো অভাব না হয়।

عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه (النسائي: (3175) وأحمد: (22396)

ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে।"-*সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫*

عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه النسائي: (3174) (وأحمد 7128)

আবু হুরাইরা বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত।" *-মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)*

দেখুন, হাদিসের সব আম বা ব্যাপক। সুতরাং তাকে নির্দিষ্ট কোনো দলের সাথে খাস করার কোনই যুক্তি নেই। পূর্ববর্তী আলেমগণও হাদিসের এই ব্যাপক অর্থই বুঝেছেন। তাদের বুঝ নিশ্চয়ই আমাদের বুঝের চেয়ে উত্তম। ইমাম বাইহাকী 'আসসুনানুল কুবরা'য় আবু হুরাইরা রাযি. এর হাদিসটি বর্ণনা করার পরে ইমাম আবু ইসহাক ফাযারীর বক্তব্য নকল করেছেন। আবু ইসহাক ফাযারী বলেন,

وددت أني شهدت ما ربد بكل غزوة غزوتها في بلاد الروم. (السنن الكبرى للبيهقي: 9 : 297 ط. دار الكتب العلمية: 1424 هـ).

"আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে, আমি রোমে যত যুদ্ধ করেছি এর পরিবর্তে যদি (হিন্দুস্তানের) মারবাদে যুদ্ধ করতাম।" *-আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী, ৯/২৯৭*

আবু ইসহাক ফাযারী (মৃ: ১৮৬ হি.) হলেন ইমাম আওযায়ীর খাস শাগরেদ, তিনি ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত জিহাদের বিধিবিধান সংকলন করেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন,

لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بلا مدافعة (سير أعلام النبلاء 16/ 69)

"জিহাদের বিধিবিধানের ব্যাপারে আবু ইসহাক ফাযারীর কিতাবের মত কোন কিতাব কেউ সংকলন করতে পারেনি। আবু হাতেম রাযী. রহ. বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আবু ইসহাক ফাযারী অনুসরণীয় ইমাম।"–সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৬/৬৯

লক্ষ করুন, আবু ইসহাক ফাযারী রহ এই হাদিসের কারণে রুমে যত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর পরিবর্তে হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, যা থেকে বুঝা যায়; তিনি হিন্দুস্তানের কাফেরদের সাথে সংঘটিত সব যুদ্ধকেই এই হাদিসের মেসদাক-উদ্দেশ্য মনে করছেন। কেননা এই হাদিসের উদ্দেশ্য যদি শুধু সাহাবীদের যমানায় সংঘটিত প্রথম যুদ্ধই হতো, তবে তার এই আকাঙ্ক্ষার কোন অর্থই হতো না।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের দলিলস্বরূপে সেসকল হাদিস একত্রিত করেছেন যে হাদিসগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তিনি গাযওয়াতুল হিন্দের হাদিসও উল্লেখ করেছেন, এরপর গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে সত্য হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

وقد غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجرت هناك أمور فذكرناها مبسوطة، وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود أربعمائة ففعل هنالك أفعالا مشهورة وأمورا مشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه ورجع إلى بلاده سالما غانما (النهاية في الفتن: 1/18 دار الجيل، 1408 هـ)

"মুসলমানরা মুয়াবিয়া রাযি. এর শাসনামলে তেতাল্লিশ হিজরিতে হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এরপর গজনীর অধিপতি মহান বাদশাহ মাহমুদ বিন সবুক্তগীন চারশো হিজরির দিকে হিন্দুস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তিনি সেখানে মহান কারনামা আঞ্জাম দিয়েছেন, প্রশংসাযোগ্য অনেক কাজ করেছেন। সোমনাথ মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তি ভেঙ্গেছেন এবং তার ভিতরে রক্ষিত হিরা-জহরত নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।" -আননিহায়া ফিল ফিতান, ১/১৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে।"-সুনানে নাসায়ী, ৩১৭

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইবনে কাসীর রহ. মুয়াবিয়া রাযি. এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধ এবং মাহমুদ গজনবীর ভারত অভিযান সবগুলোকেই গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসের মেসদাক ধরছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, তিনি গাযওয়াতুল হিন্দকে নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধ মনে করতেন না।

গাজওয়াতুল হিন্দ পুরাই ভ্রান্তধারনা
Dr. Abubakar Zakariya

গাজওয়াতুল হিন্দ কি?
- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

কমেন্ট

Salman Rumi

জাযাকুমুল্লাহ ভাই!
আমি আসলে কল্পনাও করিনি তাহকীকে এমন কিছু উঠে আসতে পারে। এ বিষয়টা কখনোই কল্পনা করিনি যে, গাজওয়াতুল হিন্দ এখনো সংঘটিত হয়নি—এই ধারণা পোষণকারীদের ধারণাও ভুল। মানহাজের অধিকাংশ ভাই মনে হয় এ বিষয়টা জানেন না। আমি নিজেও তো আপনার এই লেখা পাঠ করার পূর্বে ধোঁয়াশার মধ্যে ছিলাম। একটা বিষয় খারাপ লাগছে, দুর্বল সূত্রে বর্ণিত যে হাদীসটিতে গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়ের সুসংবাদ এবং মুশরেকদেরকে শিকল পরিয়ে টেনে নেয়ার সুসংবাদ রয়েছে, সেটা কি তাহলে ভুলে যেতে হবে? যাই হোক আশা করি সাময়িক এই মন খারাপ ভাব চলে যাবে ইনশাআল্লাহ! তবে এটা তো অবশ্যই খুশির সংবাদ যে, এই ভূভাগে আমরা মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেটা গজয়াতুল হিন্দের শামিল হবে আলহামদুলিল্লাহ! মানুষকে একথা বোঝাতে হবে, সম্মান নিয়ে শাহাদাত বরণ করার মধ্যে কখনই পরাজয় নেই। আসল পরাজয় তো হচ্ছে, মুমিনরা নিজেদের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে যাওয়া। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক!

Salahuddin Aiubi

মাশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ। বাকি এ ব্যাপারে আরো ইমামগণের মতামতও নিয়ে আসা যেতে পারে। কারণ এ রকম অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারেই তো আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন: ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কেউ বলেছেন: এখনো হয়নি, সামনে হবে। যারা বলেছেন, সামনে হবে তাদের দলিল ও যুক্তিগুলোও এখানে আলোচনা করলে বিষয়টা ভালোভাবে বুঝা যেত। আর যে ক'টি যয়ীফ হাদিস আছে, সেগুলোর মান নিয়েও একটু বিশ্লেষণ করলে ভালো হয়। যাতে ওই হাদিসগুলো কি একেবারে বলার অযোগ্য, নাকি কম শক্তিশালী হলেও বলা যায় কিংবা অন্যান্য 'শাহিদ' (সমর্থক) হাদিসের কারণে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয় সেটা জানা যায়। আশা করি, ভাই এ বিষয়গুলো খেয়াল করবেন ইনশাআল্লাহ।

Salman Rumi

জাযাকুমুল্লাহ ভাই!
একটা বিষয় খারাপ লাগছে, দুর্বল সূত্রে বর্ণিত যে হাদীসটিতে গাজওয়াতুল হিন্দ বিজয়ের সুসংবাদ এবং মুশরেকদেরকে শিকল পরিয়ে টেনে নেয়ার সুসংবাদ রয়েছে, সেটা কি তাহলে ভুলে যেতে হবে?

আদনান মারুফ

একেবারে ভুলে যেতে হবে এমন নয়, বরং নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা যাবে না যে, এমনটাই ঘটবে। বরং সম্ভাবনার পর্যায়ে রাখতে হবে, হলে হতেও পারে, না ও হতে পারে। কারণ, হাদিসটা যয়ীফ হলেও মওযু বা জাল নয়। কারণ হাদিসের মধ্যে কোন কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী নেই। শুধু একজন রাবীর নাম মুবহাম বা অজ্ঞাত। বাকীরা ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য। আহলে হাদিসদের সমস্যা হলো, ওরা যয়ীফ ও মওযুর মধ্য পার্থক্য বুঝে না, বা বুঝলেও নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য মানতে চায় না। এ কারণেই আবু বকর যাকারিয়া দুটি হাদিস ব্যতীত বাকী সবগুলোকে বানোয়াট বলে দিয়েছে। এটাও ওর মূর্খতার একটা প্রমাণ। আসলে এগুলো রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী "কিয়ামতের পূর্বে মূর্খরাই নেতা বনে যাবে, তারা নিজেদের মনগড়া ফতোয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, ইসলামকে ধ্বংস করবে" এর প্রতিফলন। আল্লাহ আমাদের এদের থেকে সতর্ক থাকার তাওফিক দান করুন।

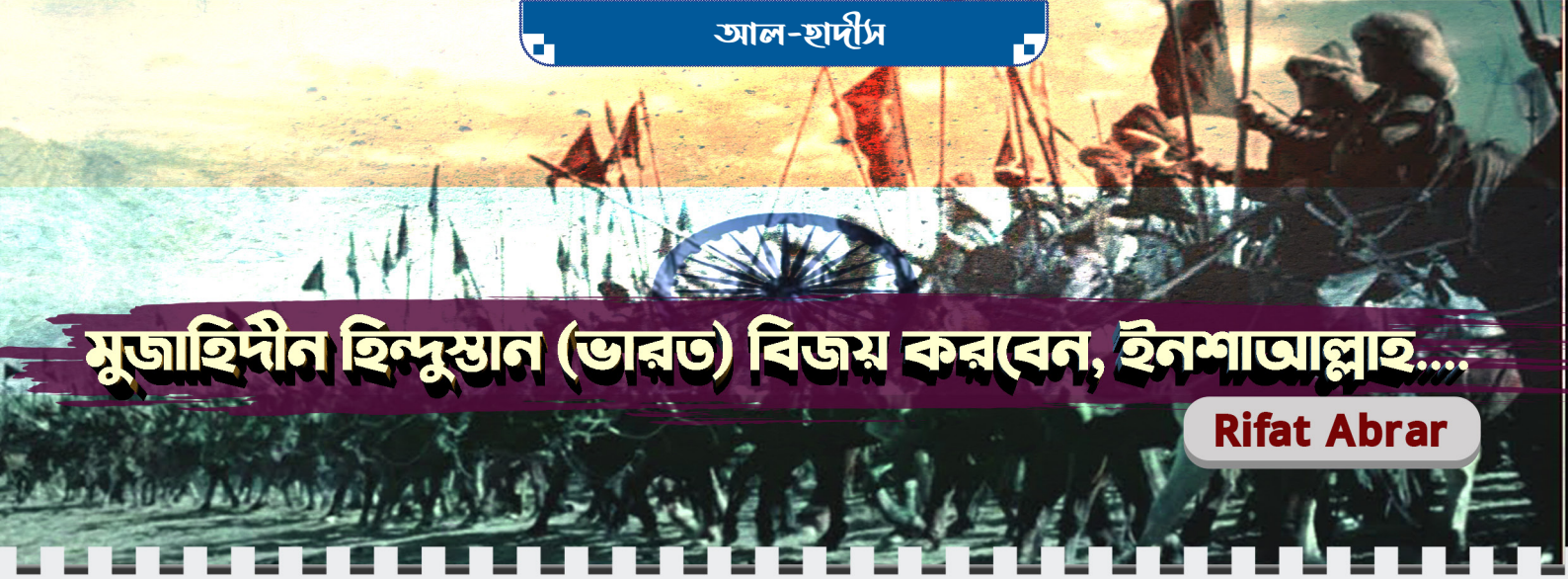

মুজাহিদীন হিন্দুস্তান (ভারত) বিজয় করবেন, ইনশাআল্লাহ....

Rifat Abrar

আল্লাহর সৈনিক মুজাহিদীনগণ ভারত বিজয় করবেন ইনশাআল্লাহ

হাদীস নং- ১.

হযরত সাওবান (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজাদকৃত গোলাম)রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আমার উম্মতের দু'টি দল, যাদের আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। প্রথমটি হচ্ছে, যারা হিন্দুস্তান (ভারত)-এর সাথে যুদ্ধ করবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা ঈসা বিন মারইয়াম আ.-এর সাথে থাকবে। (সুনানে নাসাঈ, মোসনাদে আহমদ)

হাদীস নং- ২.

হযরত আবু হুরায়রা রা.বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি যদি ওই যুদ্ধ পেয়ে যাই, তবে তার জন্য আমি আমার জান-মাল সব কোরবান করে দেব। আমি যদি সেখানে শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি সর্বোত্তম শহীদের মধ্যে গণ্য হব। আর যদি বেঁচে ফিরে আসি, তবে আমি আবু হুরায়রা ১০০% জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে ফিরব। (সুনানে নাসায়ী)

হাদীস নং- ৩.

হযরত আবু হুরায়রা রা.থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। শেষ পর্যন্ত তারা হিন্দুস্তানের প্রতাপশালী সম্রাটদের শিকলে বন্দি করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ পাক তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর তারা যখন ওখান থেকে ফিরে আসবেন, তখন শামে ঈসা বিন মারইয়াম আ.-কে পেয়ে যাবে। অতঃপর আবু হুরায়রা রা.বলেন, আমি যদি ওই যুদ্ধ পেয়ে যাই, তবে আমি আমার নতুন পুরাতন সকল আসবাবপত্র বিক্রি করে যুদ্ধ করার জন্য চলে যাবো। সুতরাং আল্লাহপাক যখন আমাদের বিজয় দান করবেন, আর আমারা ফিরে আসবো।,তখন আমি আবু হুরায়রা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হবো। অতঃপর আমি যখন শামে আসবো, তখন ঈসা বিন মারইয়াম আ.কে পেয়ে যাব।। ওই মুহূর্তে আমি ঈসা আ.এর সন্নিধানে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ব। অতঃপর ঈসা আ.এর কাছে গিয়ে বলব, আমি হলাম শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা.এর সাহচার্য প্রাপ্ত একজন সাহাবী। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রার এ কথা শুনে মুচকি হেসে দিয়ে বলতে লাগলেন, (হে আবু হুরায়রা! এ ঘটনা) অনেক দূরে অনেক দূরে। (আল ফিতান-নুআইম ইবনে হাম্মাদ, এ হাদীসের সনদ দুর্বল)

ফায়দা: হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফজিলত উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আন্দাজ করা যেতে পারে। সেখানকার মুজাহিদীনদের মর্যাদা ওই সকল মুজাহিদীনের সমান হবে, যারা ঈসা আ.এর সাথে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটা এ জন্যই বলেছেন, এমনটি যাতে না হয়, বিশ্বের সকল মুজাহিদীন ইমাম মাহদীর সাথে যুদ্ধ করার আশায় আরব বিশ্বে গিয়ে একত্রিত হয়ে যাবে, আর হিন্দুস্তানের সবাই গাফিল হয়ে থাকবে। অথচ হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মিশনও সেই মিশন, যা সফল করার জন্য ইমাম মাহদী যুদ্ধ করবেন। সুতরাং হিন্দুস্তান তথা ভারতের মুজাহিদীনের জন্যও একই রকম মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। সাথে সাথে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে, যাতে করে হিন্দুস্তান বিজয়কারীদের মনে কোনোরূপ অসন্তুষ্টি না থাকে, ইমাম মাহদী বা ঈসা আ. এর সাথে থেকে জিহাদ করার সৌভাগ্য নসিব হলনা। তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই, ফিরে এসে তারা ঠিকই ঈসা বিন মারইয়াম আ.কে পেয়ে যাবে। এ

সকল হাদীসে ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দুস্তানের কঠোর মনোভাবের বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাশাপাশি দাজ্জালের জোটবদ্ধ সেনাদলের সাথে ভারতের সখ্যের ব্যাপারও আন্দাজ করা যায়। এ কারণেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের জন্য স্বয়ং দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সমান মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদীদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত। পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রতিককালে ভারতকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ইহুদীদের পূর্ণ জোর হচ্ছে ভারতকে শক্তিশালী করার প্রতি। কেননা, এতদ অঞ্চলেই ওই বরকতময় স্থান বিদ্যমান, যেখান থেকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে একটি দল বের হয়ে ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করবে। এর পূর্বেই ইহুদীরা ভারতকে মহাপরাশক্তি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং ওই সকল শক্তিকে নিঃশেষ করে দিতে চায়, যারা ভারতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাকিস্তানের উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর ভারতের জন্য একের পর এক মহানুভবতার বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিৎ। কাশ্মীর যুদ্ধের সমাপ্তি, পাকিস্তানের মুজাহিদীনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পাকিস্তানের পাহাড়ী অঞ্চল ও আফগানিস্তানের মুজাহিদীনের উপর একের পর এক চাপ বৃদ্ধি, এ বিষয়গুলো দেখেও কি আমাদের অন্তরে উদয় হয় না? আমাদের দুশমনেরা আমাদের পূর্বেই এ সকল হাদীসের উপর আমল শুরু করে দিয়েছে। আর আমরা সব কিছু ভুলে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তিবর্গের কোনোরূপ পেরেশানির সম্মুখীন হওয়ার দরকার নেই; বরং তাদের পূর্বের তুলনায় আরো পূর্ণ মনোবল নিয়ে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে দেয়া দরকার। হিন্দু আর ইহুদীদের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ সত্য ধর্ম নিঃশেষ করার জন্য যতোই চাল চালানোর, চালতে থাকুক, কিন্তু মুহাম্মাদ আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্য খোদা তা ধূলিসাতের ব্যবস্থাপনাও তৈরি করেছেন। হিন্দু আর ইহুদীদের এ ষড়যন্ত্র এবং তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা তাদের নিজেদের উপরই পতিত হবে। যার মাধ্যমে মুজাহিদীন নতুন রাস্তা বের করতে সক্ষম হবে। মাঝখান দিয়ে শুধু আল্লাহ পাক তাঁর সত্যায়নকারী বান্দাদের একটু পরখ করে নিতে চাইবেন। অপরদিকে হিন্দুস্তানের জিহাদে মাল সম্পদ ব্যয় করার বিষয় এতই গুরুত্বের সাথে বলা হচ্ছে, স্বয়ং আবু হুরায়রা রা. বলছেন, 'ঐ জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমি আমার সকল নতুন পুরাতন আসবাব বিক্রি করে দেব।' হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত কা'ব রা. বলেন, বাইতুল মাকদিসে একজন বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবেন। ওই বাহিনী হিন্দুস্তান বিজয় করবে, ওখানকার সকল ভান্ডার উদ্ধার করে দিয়ে বাইতুল মাকদিস সাজিয়ে তুলবে। তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদের বন্দি করে নিয়ে আসবে। ঐ বাহিনী দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তান অবস্থান করবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা.বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি যদি ওই যুদ্ধ পেয়ে যাই, তবে তার জন্য আমি আমার জান-মাল সব কোরবান করে দেব। আমি যদি সেখানে শহীদ হয়ে যাই, তবে আমি সর্বোত্তম শহীদের মধ্যে গণ্য হব। আর যদি বেচেঁ ফিরে আসি, তবে আমি আবু হুরায়রা ১০০% জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে ফিরব।

(সুনানে নাসায়ী)

ফায়দা:

১. জিহাদের বিরুদ্ধাচরণকারীগণ মন্তব্য করে থাকে, দিল্লির লাল কেল্লায় ইসলামের ঝান্ডা উড়ানোর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ আর পেঁচার দিবা স্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। অথচ উপরোক্ত হাদীস এবং পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলোতে আপনি স্পষ্ট পড়ে এসেছেন, এটা কোনো পাগলের স্বপ্ন নয়; বরং এটা হচ্ছে ওই সত্য প্রতিশ্রুতি, যা সত্য নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ যামানার মুজাহিদীনকে দিয়ে গেছেন। আর যে প্রতিশ্রুতি আমাদের নবী দিয়ে গেছেন, তা অবশ্যই মিথ্যা হবে না। ভারত যতোই শক্তিশালী হয়ে উঠুক না কেন, যতো বিশাল পরিমাণ সেনাবাহিনীই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত করুক না কেন, মহান আল্লাহ পাক ওইদিন অবশ্যই এনে ছাড়বেন, যেদিন দিল্লীর লাল কেল্লায় ইসলামের কালেমা খচিত ঝান্ডা পতপত করে উড়তে থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে, বাইতুল মাকদিস থেকে একজন বাদশা (শাসক) হিন্দুস্তানের

দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করবে। আমরা যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাই, বাইতুল মাকদিস থেকে কোন বাহিনী এ পর্যন্ত হিন্দুস্তান বিজয় করার জন্য আসেনি। সুতরাং রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। বাইতুল মাকদিস থেকে আসা বাহিনীতে সব মুজাহিদীন শামিল থাকতে পারে। বর্তমান কাশ্মীর যুদ্ধে সুমহান ত্যাগের যে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ করছি, ইনশাআল্লাহ তা শেষ হয়ে যাবে না ; বরং আল্লাহ চান তো এ ধারাবাহিকতাই প্রতিশ্রুতি মহাবিজয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

২. আজকাল ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বের ধনভাণ্ডারগুলো ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। উক্ত হাদীসে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে। পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। এ ধনভাণ্ডার যুদ্ধলব্ধ মাল হয়ে মুজাহিদীনেরই পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ।

৩. এ সেনাদল আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে। কেননা, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পর কুফর ও ইসলামের মধ্যকার যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে।
ইনশাআল্লাহ

আমরা যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তবে দেখতে পাই, বাইতুল মাকদিস থেকে কোন বাহিনী এ পর্যন্ত হিন্দুস্তান বিজয় করার জন্য আসেনি। সতরাং রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। বাইতুল মাকদিস থেকে আসা বাহিনীতে সব মুজাহিদীন শামিল থাকতে পারে। বর্তমান কাশ্মীর যুদ্ধে সুমহান ত্যাগের যে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ করছি, ইনশাআল্লাহ তা শেষ হয়ে যাবে না ; বরং আল্লাহ চান তো এ ধারাবাহিকতাই প্রতিশ্রুতি মহাবিজয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মুমিনদের ৫ দফা কর্মসূচি

নিশানে হক
Senior Member

হারেস আল আশআ'রী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (সে কাজ গুলো হচ্ছে)

ক) আল জামা'আহ (সংগঠন/ঐক্য) - একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।
খ) আস্ সামউ' - আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা।
গ) আত ত্ব-আহ - আমীরের নির্দেশ পালন করা।
ঘ) আল হিজরাহ - হিজরত করা।
ঙ) আল জিহাদ - আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা।

রেফারেন্সঃ তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন ; মুসনাদে আহমদ ১৭২০৯ ; জামেউল আহাদীস ৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান ৬২৩৩ ; সহীহ ইবনে খুযাইমা ১৮৯৫ ; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫১৪১ , তাহকীকঃ মুসনাদে আহমদ , সহীহ ইবনে খুযাইমা ও সহীহ ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

দাওয়াত এসেছে নয়া যমানার,
ভাঙ্গা কেল্লায় ওড়ে নিশান।

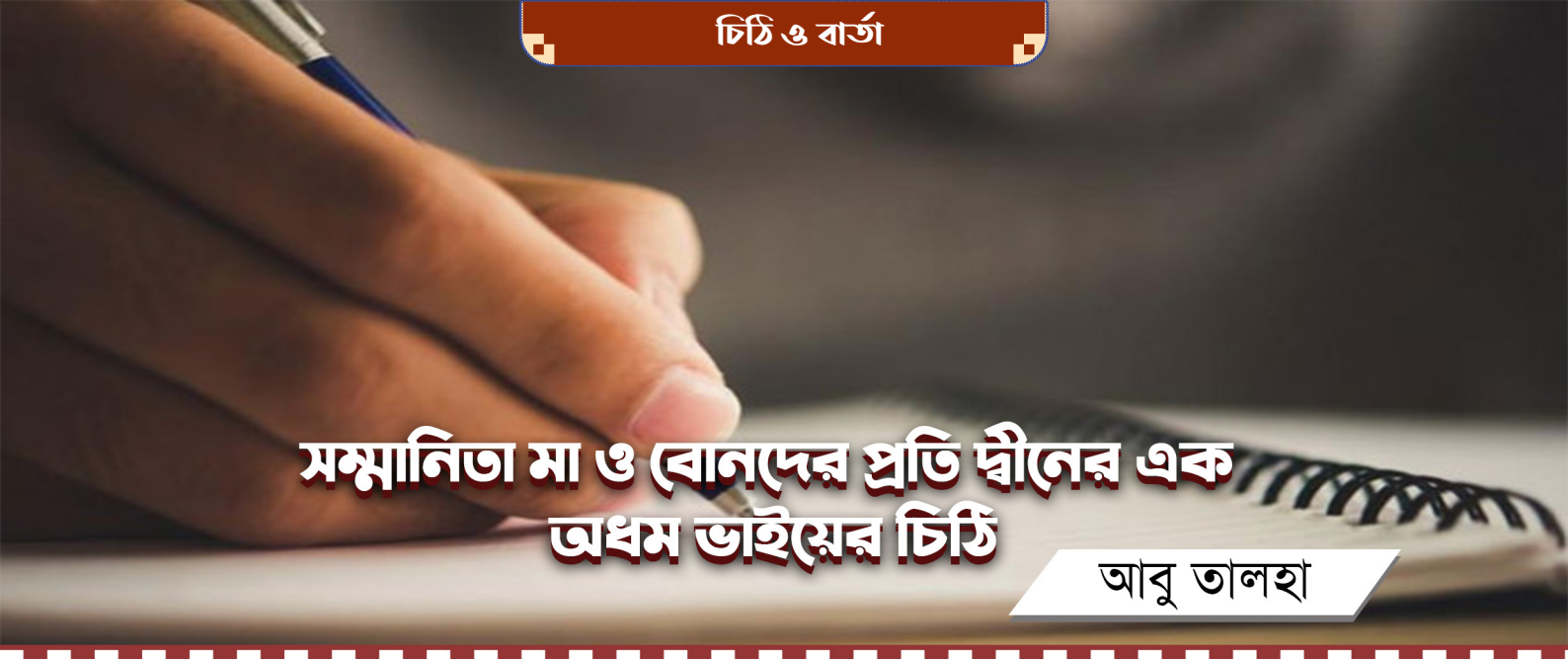

সম্মানিতা মা ও বোনদের প্রতি দ্বীনের এক অধম ভাইয়ের চিঠি

আবু তালহা

বিসমিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু করছি। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য জান্নাতে একটি এবং জাহান্নামে একটি স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। হয় আমরা জান্নাতি হব কিংবা জাহান্নামী। আল্লাহর কাছে আমরা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জান্নাত কামনা করি।

আজকে আমার এই চিঠি দ্বীনের সম্মানিতা মা বোনদের উদ্দেশ্যে পেশ করা। আল্লাহই তাউফিকদাতা। কি নিয়ে আমার এই চিঠি? চিঠির বিষয়টি হচ্ছে – "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ"। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। কেন আমি এই চিঠি লিখছি তা চিঠির উপযুক্ত স্থানে আমি উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। চলুন প্রথমে আমরা কিছু আয়াত দেখি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ এর ব্যাপারে আমাদের কি কি জানিয়েছেন?

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা: ২৬১-২৬২)

অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দানের উদাহরণ হিসেবে আল্লাহ যে উপমা পেশ করেছেন; তা থেকে বুঝে আসে যে, আল্লাহর রাস্তায় দান আল্লাহ ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে দেন। অর্থাৎ, কেউ যদি ১০০ টাকা সাদাকা করে তবে তা হয়ে যাবে ৭০, ০০০ টাকা সাদাকা করার সমান ইনশা আল্লাহ। একই ভাবে কেউ যদি ১০০০ টাকা সাদাকাহ করে তবে তা হয়ে যাবে ৭, ০০, ০০০ টাকা সাদাকাহ করার সমান! চিন্তা করেন সাত লক্ষ! এত গেলো শুধু সাওয়াব এর কথা। আজর এবং জাযা দুইটি আলাদা যদিও একই রকম মনে হয়। আল্লাহ ৭০০ গুনের একটা হিসাব আমাদের জানিয়েছেন যা আমাদের বুঝে আসে, সাধারণত এটিই আমরা বেশি লক্ষ্য করি। কিন্তু এর চেয়েও দামি ঘোষণাটি আমরা প্রায়ই নজরে আনিনা। তা হচ্ছে - তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। আল্লাহ বলছেন - এমন বান্দাদের জন্য সেদিন কোন ভয় থাকবে না, কোন চিন্তা থাকবে না। কেন থাকবে না? কারণ আল্লাহ তা দূর করে দিবেন এজন্য! এটি কোন দিন?

ইয়াওম আল আজিম! যে দ্বীনের ভয়াবহতার ব্যাপারে আল্লাহ কসম করেছেন! যেদিন ৫০ হাজার বছর মানুষকে শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আল্লাহ বলছেন সেদিন তারা কোন দুশ্চিন্তা করবে না! আরেকটি আয়াত দেখি –

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যে সকল লোক দিবারাত্রে গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন-সম্পদ দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে।সুতরাং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। [সুরা বাকারা ২:২৭৪]

দেখুন সেই একই কথা, একটি হচ্ছে আজর আরেকটি হচ্ছে জাযা। আল্লাহ একবার উল্লেখ করেছেন পুরস্কার এবং আরেকবার উল্লেখ করেছেন, সেদিন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না।

সম্মানিতা মা ও বোনেরা! আমি অনুরোধ করব, আসুন আমরা এই আয়াত ২টি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করি। গভীরভাবে ভাবুন। গভীরভাবে ভাবা বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি? স্মরণ করুন সেই মুহূর্তটির কথা, যখন আল্লাহ মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম নাজিল করলেন। সাহাবাগণ সেই আয়াত শুনে সবাই ঘরে গিয়ে নিজেদের মদের সংগ্রহ সব রাস্তায় ঢেলে দিলেন, যার মুখে মদ ছিলো ফেলে দিলেন, যিনি গিলে ফেলেছেন তিনি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কেন এই আয়াত নাজিলের সাথে সাথে উনাদের এই অবস্থা হয়েছিলো? কারণ উনারা কুরআনকে বুঝেছিলেন। এটিই ছিলো কুরআনকে বুঝার নমুনা। তাহলে বলছিলাম চলুন আমরা চিন্তা-ভাবনা করি আয়াত ২ টি নিয়ে। আল্লাহ বলছেন এক দল লোকের কথা, যারা কিয়ামতের দিন কোন দুশ্চিন্তা করবে না, কারণ আল্লাহ তাদের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবেন। এটা কি ভাবা যায় সেই মহা সংকটের দিন আমি, আপনি নিশ্চিন্তে থাকবো। আচ্ছা আজ যদি জিবরিল (আঃ) আমাদের সামনে এসে বলতেন, "ওহে আল্লাহর বান্দা ! সেই ভয়াবহ দিনের আজাব থেকে যদি নিশ্চিন্তে থাকতে চাও, তাহলে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করতে থাকো"। তাহলে আমরা কি উৎসাহিত হতাম না? জিবরিল আঃ আমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু এই আয়াত তো জিবরিল (আঃ)ই নিয়ে এসেছেন আমার চেয়ে অনেক উত্তম ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তাহলে আমরা উৎসাহিত হচ্ছিনা কেন? আরেকটি আয়াত দেখি –

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিবে; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। " (সূরা আল হাদীদ: ১১)

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, আর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারা: ২৬১-২)

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ্য করুন আল্লাহ আমাদের মত নগণ্য বান্দাদের উৎসাহিত করার জন্য কতই না সুন্দরভাবে বলছেন, কে আছে যে আমাকে উত্তম ঋণ দিবে! একবার ভেবে দেখুন তো ... আল্লাহ আমাকে আপনাকে ডেকে বলছেন, "আমাকে কিছু ঋণ দিবে কি? আমি তোমাকে এটা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবো। শুধু তাই নয়, যেদিন কেউ তোমার কোন সাহায্যে আসবে না - সেদিন তোমার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রাখবো"। এমন কেউ কি আছেন যিনি আল্লাহর এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবেন?

সম্মানিতা মা ও বোনেরা আমার, ওয়াল্লাহি, আল্লাহ তো ঠিক এটাই বলেছেন। ঠিক এটাই...। আয়াতটা পড়ে দেখুন তো, আমি মিথ্যা কিছু বলছি কিনা! জগতসমূহের মালিক, জান্নাত এবং জাহান্নামসমূহের মালিক, সমস্ত মালিকদের মালিক - আমার আপনার কাছে ঋণ চাচ্ছেন অথচ যিনি কিনা আল-গনী! কেন? হায় তা যদি বুঝতাম! এজন্য যে তিনি আমাদের কত ভালোবাসেন, কত মুহাব্বাত করেন! তিনি তো আস সমাদ তথা অমুখাপেক্ষী, ঋণের তার কি প্রয়োজন? ওয়াল্লাহি প্রয়োজন তো আমাদের। একবার ভেবে দেখুন তো, কেমন রব্ব তিনি যে, আমাদেরই প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজন জেনেও আমরা তা উপেক্ষা করব। তাই তিনি রব্বুল আরশিল আজিম বলছেন, "কেউ কি আছে আমাকে কিছু উত্তম ঋণ দিবে, বিনিময়ে আমি তোমাকে সেই পুরস্কার দিব যা না পেলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে..."

উপরে বলে এসেছিলাম, কেন আমি এই চিঠি লিখছি তা আপনাদের জানিয়ে দিবো। এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো - কিভাবে আমরা সাদাকাহ এর জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করতে পারি।

এমন অবস্থায় আমি নিয়্যত করলাম আল্লাহ চান তো আমি একটা চিঠি লিখবো। এরপরে ভাবলাম আমি যে অন্যকে চিঠি লিখবো কিন্তু তার আগে আমার নিজের ঘরের খবর কি? আমি গেলাম আমার মা এর কাছে। উনাকে জিহাদের ব্যাপারে কিছু কথা শুনালাম। এর পরে বললাম – "মা, আল্লাহ বলেছেন জিহাদের জন্য জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করতে। আপনি জান দিয়ে জিহাদ করে পারছেন না এ ব্যাপারে আপনার ছেলেকে আদেশ করুন। আর আপনার নিজের জন্য মাল দিয়ে জিহাদে অংশ নিন"। আমার মা বললেন, "বাবা তুই তো জানিস আমার নিজের কোন কামাই নাই, নিজের জমানো কোন সম্পদ ও নাই"। আমি বললাম, "মা আছে"।

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি আছে বাবা?" আমি লজ্জা নিয়ে বললাম, "মা, আমি জানি আছে। কিন্তু আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে।" মা আবারো জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা সেটা কি"? আমি বললাম, "মা আমি যা বলবো তা আল্লাহর জন্যই বলবো তাই বলার ক্ষেত্রে আমি কোন লজ্জা করবো না। আপনি যেখানে কিছুই দেখছেন না, সেখানে আমি অনেক কিছু দেখছি। মা আমি জানি আপনার কিছু স্বর্ণের গয়না আছে। আমি জানি না আপনি সেগুলো দিয়ে কি করবেন, তবে আমি আপনাকে তা আল্লাহর কাছে জমা দিয়ে দেয়ার দাওয়াত দিচ্ছি"। আমার মা বললেন, "ঠিক আছে বাবা, আমার কানের এক জোড়া দুল আছে। আমি সেটা দিয়ে দিলাম।" প্রশংসা শুধুই আল্লাহর।

'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' (সূরা আলে ইমরান ৩/৯২)।

আমি তখনও চিঠি লিখিনি। আমি ভাবলাম আমি আমার মা বোনদের সামনে ঠিক এভাবেই দাবি জানাবো ...। আমি জানি, কম বেশি অনেক মা-বোনের কাছে স্বর্ণের গয়না থাকে। উনারা হয়ত সেভাবে খেয়ালও করেন না। অনেকে খেয়ালও রাখেন না, এগুলোর জন্য যাকাত ফরজ হয়ে যায়। কারো কারো কাছে তো এত বেশি থাকে, যা সাধারণভাবে আমাদের কল্পনারও বাইরে। আমি সেসব মা বোনদের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা নিয়্যত করুন ইনশা আল্লাহ...। চলুন তার আগে আর একটি আয়াত দেখে নেই।

আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ–

'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা সবই জানেন' (সূরা আলে ইমরান ৩/৯২)

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের প্রিয় বস্তু থেকে দান করতে বলছেন। এমন কিছু যার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে, যা আমাদের প্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই মা এবং বোনদের নিকট প্রিয় হয় অলঙ্কার। আমি আপনাদের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে আপনাদের নিকট যা আছে তার বাস্তবতা একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশ আল্লাহ। আমাদের অধিকাংশের কাছে যে স্বর্ণ থাকে, তা দেখা যায় বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে এমনিই পড়ে থাকে। অনেকে চিন্তা করেন এটা দুঃসময়ের জন্য কাজে লাগবে। অনেকের আলমারিতে বছরের পর বছর এই অলঙ্কার পড়েই থাকে। একবার চিন্তা করে দেখুনতো, আল্লাহ না করুন; আগামীকাল আপনার এই স্বর্ণ যদি চুরি হয়ে যায়, তাহলে আপনি কি করবেন? কিংবা আগামীকাল আপনি যদি মারা যান তাহলে আপনার এই স্বর্ণ কবরে আপনার কি উপকারে আসবে? দেখেন আল্লাহ কি বলছেন –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"হে ঈমানদাররা! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪]

কত স্পষ্ট, তাই না? প্রশ্ন হতে পারে কেন আমি শুধু বিশেষ করে স্বর্ণের কথাই বলছি? উপরের আয়াতে এর উত্তর রয়েছে। তবে এর বাইরেও কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন, আপনার স্বর্ণের অলঙ্কার একটা দীর্ঘ সময় শুধু অলস পড়েই থাকে, তা না আপনার কোন

সরাসরি উপকার করে, না তা থেকে অন্য কেউ সরাসরি উপকার পেয়ে থাকে। উপরন্তু অনেকে বেখেয়ালে ফরয যাকাত এর কথা ভুলে গিয়ে মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেন। অনেকে স্বর্ণকে নিজেদের জন্য এক রকম নিরাপত্তামূলক সম্পদ মনে করেন। এটাকে নষ্ট করতে চান না। কিন্তু বাস্তবে আসলে দেখা যায় এই স্বর্ণ, মা তার মেয়ের জন্য আর মেয়ে তার মেয়ের জন্য দিয়ে যান। স্বর্ণ তার জায়গায় ঠিকই থাকে কিন্তু মা বোনেরা কবরে চলে যান। কেমন হয় যদি আপনার এই মূল্যবান সম্পদ আপনার আলমারিতে অলস বসে না থেকে এটা আল্লাহর দ্বীনের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় এবং আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদগণ এ থেকে কল্যাণ লাভ করেতে পারেন? আরো একটি কারণ, শয়তানের ধোঁকা এবং ভয়। শয়তান বলবে আরে তুই দরকার হয় ৫ হাজার টাকা সাদাকাহ করে দে, কিন্তু স্বর্ণ দিস না। আরে এটা স্বর্ণ, একবার চলে গেলে আর করতে পারবি? অনেকে এই চিন্তায় পিছিয়ে আসেন। স্বর্ণও যে সাদাকাহ করা যায়, এটা অনেকে ভাবতেই চান না। শয়তানের সেই ওয়াস ওয়াসা এবং ভয়কে মোকাবেলা করার জন্য এটি দরকার। আমাদের নিরাপত্তা স্বর্ণের মধ্যে নয় বরং তা আল্লাহর জিম্মায়।

আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা!
আমার চিঠি শুধু লম্বা হয়েই যাচ্ছে। আমি আর বেশি সময় নিবো না, ইনশা আল্লাহ। আমি আপনাদের সরাসরি দাওয়াত দিচ্ছি। আপনাদের সামনে যদি আল্লাহ এই দাওয়াত উপস্থিত করে দেন, তাহলে কোন দ্বিধা না রেখে আল্লাহর জন্য নিয়্যত করে নেন। নিশ্চিত জানেন আপনি ঠকবেন না। ওয়াল্লাহি! আপনার স্বর্ণ আরও উত্তম স্বর্ণ হয়ে আপনার কাছে ফিরে আসবে। আপনি চাইলেও এই স্বর্ণকে আপনার সাথে সারা জীবনের জন্য রাখতে পারবেন না। কিন্তু আপনার জান্নাতি স্বর্ণ অনন্ত কালের জন্য আপনার কাছে থাকবে। আমি প্রমাণ দিচ্ছি।

আবু দারদাহ (রাঃ) তাঁর উত্তম খেজুরের বাগান জান্নাতের বিনিময়ে দান করে দিয়েছিলেন। মুসলিম শরীফে এসেছে, জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) আবু দারদাহ (রাঃ)এর জানাযা করে ফিরে আসার সময় বলেন,

كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لأَبِي الدَّحْدَاحِ

'আবু দারদাহর জন্য জান্নাতে কতই না অধিক খেজুরের ঝুলন্ত কাঁদি রয়েছে! (মুসলিম হা/৯৬৫)

আবু দারদাহ রাঃ এর খেজুরের বাগান মদিনায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলো। তিনি তাঁর দুনিয়ার খেজুরের বাগানকে জান্নাতের বাগানের সাথে বিনিময় করে নিয়েছিলেন। অনেকে এমন থাকে, আগের যুগের পুরনো স্বর্ণ বিক্রি করে দিয়ে হাল আমলের দুবাইয়ের স্বর্ণ কিনেন। কারণ আগের দিনের স্বর্ণ এখন তেমন চলে না। আমি বরং আপনার সামনে এর চেয়েও উত্তম প্রস্তাব পেশ করছি। আপনি দুনিয়ার স্বর্ণের বিনিময়ে জান্নাতের স্বর্ণ কিনে নিন। আমার দাওয়াত তো পেশ করেই ফেললাম। এখন তাঁদের জন্য কিছু কথা যাদের কাছে কিছুই নাই। আসলেই তাঁদের কাছে কোন অলঙ্কার নাই। তাঁরা কি করবেন? তাঁরা কি কিছু করতে পারেন না? এই অংশটুকু তাঁদেরই জন্য। উপরে আমি আমার মায়ের কথা বলে এসেছি। আমি যখন আমার মায়ের সাথে বসি, তখন আমি একবারের জন্যও ভাবিনি আমার মা তাঁর গয়না দিয়ে দিবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর উপরে ভরসা করেছি এবং আমার যা বলে দেয়া দরকার তা বলে দিয়েছি। আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তাই আপনারা হাল ছাড়বেন না। আপনাদের যদি কিছুই না থাকে, যাদের আছে তাঁদের নিকট যান এবং এই চিঠিটি পেশ করেন, তাঁদেরকে আহবান করেন। আপনার হারানোর কিছুই নাই। তাঁরা গ্রহণ করুন বা না করুন, আপনি তো আপনার পুরস্কার পেয়েই যাবেন ইনশা আল্লাহ। আমার দ্বীনের ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আপনাদের মা, বোন, স্ত্রীদের কাছে চিঠিটি পড়ে শুনান। তাঁদের উৎসাহিত করেন, আল্লাহর কালাম দ্বারা, রাসূলের হাদিস দ্বারা, সাহাবাদের জীবনী দ্বারা। আল্লাহর কালাম দিয়েই শেষ করছি –

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সুরা মুযযাম্মিল ৭৩:২০]
আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো - আল্লাহই কি আমাদের সম্পদ গচ্ছিত রাখার জন্য সবচেয়ে উত্তম নন? আমাদের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে হলেও জান্নাত কি উত্তম বিনিময় নয়?

ওয়াস সালাম
মিসকিন ভাই,
আবদুল্লাহ

এই জুলুমের শেষ কোথায়??

আবু উবাদাহ

কালো কয়েকটি গাড়ি একটি বাড়ির সামনে থামল, দূরু দূরু বুকে ফাতেমা জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই আঁতকে উঠল। মা বলল, কী হলো মা.... এমন করছো কেন? ফাতেমা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, মা ওরা এসে গেছে। একটু পরই ফাতেমার বাবা ঘরে ঢুকে বলল তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ো, ওরা এসে গেছে... লুকানো হয়ত তাদের ভাগ্যে ছিল না... লুকাবার আগেই তারা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ল, সবাইকে ঘর থেকে বের করে বাড়ির উঠানে দাঁড় করালো,, ফাতেমা নিরব বাক্যে চেয়ে আছে ছোট্ট ভাইটির নিষ্পাপ চেহারার দিকে, মায়ের করুণ চাহনি ফাতেমাকে কাঁদাতে বাধ্য করল, সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ মেশিনগান থেকে তিনটি বুলেট ফাতেমার বাবা মা আর ছোট্ট ভাইটির কোমল বুকটি ছেঁদ করল। ফাতেমা চিৎকার দিয়ে কাঁদছে আর তারা ফাতেমাকে জোর করে গাড়িতে উঠালো, হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল তাকে। কিছুক্ষণ পর গাড়ি ছুটে চলল আবু গারিব কারাগারের উদ্দেশ্যে। এলাকার মানুষগুলো নীরব তাকিয়ে রইল। এভাবে একদিন ফাতেমাকে সবাই ভুলে গেল, ভুলে গেল তার পিতামাতাকে, ছোট্ট ভাই টিকেও। অনেকদিন পর একটি অচেনা চিঠি আসল, সেই চিঠিটাতে লেখা ছিল,,,,,,,, প্রিয় মুসলিম ভাই ! আল্লাহর পরিচয়ের জন্য সূরা এখলাসই যথেষ্ট। আমি তোমাদের ছোট্ট বোন ফাতেমা, আমি এখন আবু গারিব কারাগারে আছি, এখানে আমার মতো আরো অনেকেই মাজলুমাহ, আমরা এতোটাই মাজলুম যে, এখন আমরা জালিম অ্যামেরিকান বাহিনীর সন্তান গর্ভে ধারণ..... প্রিয় ভাই! তোমরা যদি আমাদের উদ্ধার করতে না পারো ! অন্তত বোমা মেরে আমাদের শেষ করে দাও... যাতে আমাদের এই শয়তানদের বাচ্চা গর্ভে ধারণ করতে না হয়...! কিছু কথা! প্রিয় ভাই আমরা যেমন বেঁচে থাকতে চাই, সুখে থাকতে চাই, এমন হাজারো ফাতেমা আছে; যারা সবসময় নিজের মৃত্যু কামনা করে... যাদের কাছে এই পৃথিবী বিষাদে ছেঁয়ে গেছে, যাদের কাছে সূর্য সারা জীবনের জন্য অস্তমিত। এখন করণীয় আমাদের সামনে স্পষ্ট, শুধু করার পালা... তাই বলি কি এই রঙিন দুনিয়ার খেল-তামাশায় আমি যেন আমার বোন ফাতেমাদের কথা ভুলে না যাই..... হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দাও...।

প্রত্যেক যুগেই সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর জন্ম হয় ! কিন্তু...

Banglar Omor

সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী(রঃ)! এমন এক লৌহ মানব, যার আতঙ্ক কুফফারদের অন্তরে আজও বিরাজমান। ক্রুসেডকে তিনি এমনভাবে ভেঙ্গেছিলেন, যা জোড়া দিতে কুফফারদের হাজার বছর সময় লেগেছে। সারা বিশ্বের কুফরী শক্তিকে তিনি এমনভাবে নাকানি চুবানি দিয়েছিলেন যে, তা আজকের কুফফাররাও ভুলে যায়নি। তাই যখনই মুসলিমরা নির্যাতিত হয়, আকসা আক্রান্ত হয়, শাম ইরাক ফিলিস্তিন রক্তাক্ত হয়, তখনই আল্লাহর সৈনিক সালাহ্উদ্দিন ন আইয়্যুবীর নাম অসহায় মুসলিমদের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। তাই আজও সালাহ্উদ্দিনের কবর জিয়ারতে গিয়ে অনেক মুসলিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আর চিৎকার করে বলতে থাকেঃ "কুম ইয়া সালাহ্উদ্দিন কুম !" উঠো হে সালাহুদ্দীন উঠো!!! আমরা আর পারছিনা! ওরা আমাদের গ্রাস করে ফেলছে! উঠো সালাহ্উদ্দিন জলদি উঠো!!! কিন্তু সালাহ্উদ্দিন তো ক্বিয়ামাতের আগে আর উঠবেননা !

তাই বলে কি আমরা সালাহ্উদ্দিনকে আর পাবো না? ক্রুসেডও কি আর ভাঙ্গা হবে না? অবশ্যই হবে ! তবে...এক ঐতিহাসিক বলেছিলেনঃ "প্রত্যেক যুগেই সালাহুদ্দীন আউয়্যুবীর জন্ম হয় কিন্তু আয়্যুবীর সেই দূর্ধর্ষ সৈন্য বাহিনীকে আর দেখা যায় না"। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর যুদ্ধ জীবনকে যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী পাবেন ৫০ মার্ক আর তার সৈন্য বাহিনী পাবে ৫০! ক্রুসেড যুদ্ধে সালাহ্উদ্দিন আর তার সৈন্য বাহিনীর অবদান সমান সমান। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী কিছুই করতে পারতেন না, যদি তাঁর সৈন্যরা আন্তরিকভাবে যুদ্ধ না করতেন। সালাহ্উদ্দিন আউয়্যুবীর প্রত্যেকটি সৈন্য ছিলেন সালাহ্উদ্দিন আউয়্যুবীর মতই। তাঁর সৈনিকগণ এমন ছিলেন, যেন তারা সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর দেহেরই একটি অংশ! সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবী (রহঃ) যুদ্ধের পরিকল্পনা করতেন, আর তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করত তার সৈনিকরা। সালাহ্উদ্দিন আইয়্যুবীর (রহঃ) প্রতিটি আদেশকে তাঁর সৈন্যরা শিরোধার্য মনে করতেন। নেতার আনুগত্যের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন আয়্যুবীর সৈনিকেরা। নেতা যেই হউক না কেন যদি তার অনুসারীরা নেতার প্রতি আনুগত্যশীল হয়, তাহলে সেই নেতা অবশ্যই যুদ্ধে সফল হবেন। কারণ, নেতা তার প্রতিটি পরিকল্পনা তার আনুগত্যশীল সৈন্যদের দ্বারা খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারবেন। আর নেতা যত বিচক্ষণ আর অভিজ্ঞ হন না কেন, যদি তার সৈন্যরা নেতার প্রতি আনুগত্য পরায়ণ না হয়, তাহলে নেতার হাজারো কৌশল আর পরিকল্পনা সবই ভেস্তে যাবে। যুদ্ধ বিজয়ের সবচেয়ে বড় বাঁধা হল, রবের পূর্ণ দাসত্ব না করা এবং নেতার আনুগত্যে অবহেলা করা। আমরা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম এবং নেতার প্রতি আনুগত্য পরায়ণ না হব, ততদিন পর্যন্ত বিজয় বিলম্ব হবেই; যদিও হাজারো সালাহুদ্দীন আইয়্যুবী আমাদের নেতৃত্ব দিক! আসুন! আমরা সালাউদ্দিনে আইয়্যুবীর অপেক্ষা না করে নিজেদেরকে সালাহউদ্দীনের সৈনিকদের মত গড়ে তুলি। তাহলে অচিরেই আমরা যুগের সালাহুদ্দীনকে খুঁজে পাবো, ইনশাআল্লাহ। যার নেতৃত্বে আমরা আক্বসাকে পুনরুদ্ধার করবো আর তাগুতের মসনদ চুরমার করে খেলাফতের সুশীতল ছায়ায় বসবাস করবো...

আবারো হাসবে সেই সূর্যটা !

সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ যখন আজ নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। ঠাঁই নেই তাদের নিরাপদে কোথাও থাকার, জায়গা নেই নিরাপদে কোথাও যাবার। কুফফার জোটের নির্মম নির্যাতন আর নিপীড়ন বেড়েই চলেছে ক্রমশ তাদের উপর; আফগান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, মালিসহ প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে যখন নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছেন আমাদের ভাই-বোনেরা, তখন আমরা 'আমরা তো শান্তিতে আছি' এই বুলি আওড়িয়ে মাজলুমানদের পক্ষে কথা বলা থেকে মুখে কুলুপ এঁটে কানে আঙ্গুল দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছি ! কারণ, আমরা শান্তি প্রিয়, শান্তশিষ্ট জনগণ। ফলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে উম্মাহর লাশের সারি, দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এক কালের পরাক্রমশালী আর আজকের অসহায় উম্মাহর শরণার্থী শিবির। গৃহহীন হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাদের ; পিতা-মাতা হারিয়ে অসহায় হয়েছেন হাজারো মুসলিম। তাদের নেই কোন মানবাধিকার। নেই বাঁচার কোন বৈধতা। মায়েদের করুন আহাজারি, বৃদ্ধদের অসহায় চোখের পানি আর নিথর নিস্তব্ধ পড়ে থাকা উম্মাহর শিশুদের নিদারুণ করুন অবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের গাফলতির নিদ ভাঙ্গাতে। আমরা পারিনি আরেকবার বিন কাসেম আর সালাহ্উদ্দিন হয়ে উম্মাহর চোখ থেকে দুঃখ, দুর্দশার পানি মুছে দিতে; পেরেছি শুধু মীর জাফর হয়ে বারবার পিছন হতে ছুরি মারতে!! উত্তরণের মহা সম্মানিত পথ ছেড়ে আমরা বেছে নিয়েছি যিল্লতির পতনের পথ! মন গড়া কল্প-কাহিনী আর ইচ্ছামাফিক কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে মসৃণ করছি পতনের পথ। বুঝেও ভান করে আছি না বুঝার, দেখেও ভান করে আছি না দেখার। আর কেউ কেউ নিষিদ্ধ বস্তু দুনিয়ার মোহে পড়ে আরেকটু ভালো থাকার আশায়, দুনিয়ার স্বাদ আরেকটু চেখে দেখার লোভে নিলামে উঠিয়েছি নিজের মহা মূল্যবান ঈমান-আমলকে। বিকিয়ে দিচ্ছি নিজের মান মর্যাদা। তারপরেও আমরা আবার সেজেছি আল্লামা আর ইসলামী চিন্তাবিদ খেতাবে !!!

নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারতে এখন আমরা সিদ্ধ-হস্ত। কাফেরদের সামান্য ইশারা আর তাগুতের ফাঁকা হুমকি ধমকিতে কাবু হয়ে যাচ্ছি আমরা, বিরোধিতা করছি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, উম্মাহর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ছায়া সরিয়ে, ঝলমলে হাস্যোজ্বল রৌদ্র আনয়নে ব্যতিব্যস্ত, নিজেদের জানের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয়কারী মুজাহিদদেরকে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ. তোমাদের উপর ফরজ করা হল ক্বিতাল, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। অপছন্দনীয় ও বন্ধুর এ পথকে নিজেদের রক্ত দিয়ে মসৃণ করা মুজাহিদদেরকে আমরা বলছি সন্ত্রাস! মানব বন্ধন করছি তাদের বিরুদ্ধে ! 'নিজেরা শান্তিতে আছি' এ বুলি আওড়িয়ে আর কত দিন আমরা পারব শান্তিতে থাকতে? (এখনো কি আমরা শান্তিতে আছি?!) অন্য মুসলিম ভাইদের বিপদে পাশে না দাঁড়ানো সেই আমাদের উপর যখন বিপদ নেমে আসবে, নেমে আসবে হিন্দুত্ববাদের কড়াল থাবা, তখন আমাদের অবস্থা কি হবে, তা নিয়ে কি কখনো চিন্তা করেছি? বড্ড হাসি পায় এবং কষ্ট লাগে, যখন দেখি অবুঝের মত নিজেদের শত্রুর কাছে নিজেদের বিপদের কথা বলে আমরা পরিত্রাণের পথ খুঁজে বেড়াই। আবেদন-আবদার করি তাদের কাছে, যারা ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আধা জল খেয়ে মাঠে নেমেছে, শপথ নিয়েছে ভু-পৃষ্ট থেকে মুসলিমদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলার। বারবার বিচার নিয়ে যাই আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের শত্রুর কাছে। জান চলে যাবে, স্ত্রী সন্তান বিধবা হয়ে যাবে, জেলে যেতে হবে এ সমস্ত ওয়াহানের কারণে সুন্নাহ সম্মত পথ ছেড়ে দিয়ে, চির শত্রু পশ্চিমাদের দেখানো পথে তাদের কাছে বিচার নিয়ে যাই। অথচ যাদের পথ থেকে বাঁচার জন্য আমরা দিনে কমপক্ষে ১৭ বার মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কিন্তু দিন শেষে সব ভুলে গিয়ে আবার তাদের দরবারেই ধরনা দিই। বড় আজীব বিষয়!! তবে উত্তাল সমুদ্রের মাঝেও তরী তীরে গিয়ে ভিড়বে; মেঘের কালো ছায়া ভেদ করে সেই সূর্যটা আবারো হাসবে। পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় কোণায় আবারো উঠবে সুমধুর আযানের ঝংকার। আবারো কেঁপে উঠবে গৌরগবিন্দের সেই অহংকার। ভূলুণ্ঠিত হবে ঔদ্ধত্য সব কুফরের শীর। নিভে যাবে কুফরের সব অন্ধকার। মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। সুতরাং এখন আমাদের মুমিন হওয়া বাকী। মুমিন হওয়ার এই শর্ত পূরণ হলে "আবারো হেসে উঠবে সেই সূর্যটা" !

আল্লাহ্ আমাদেরক

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَو

অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। এর 'তোমাদের ঈমান আনার মত' ইমান আনার তাওফীক দান করুন। আমীন।

করোনা লকডাউন এবং এক ভাইয়ের প্রশ্ন??

"এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

ফরায়েযি

মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে শুরু করছি। যে আল্লাহর স্মরণ এই নগণ্য, হীন বান্দারা ভুলে যায় কিন্তু মহান আল্লাহ প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে তাঁর বান্দাদের ফিরিয়ে আনেন তাঁর স্মরণের দিকে। এটি এজন্য নয় যে বান্দার স্মরণ আল্লাহর প্রয়োজন (নাউজুবিল্লাহ) বরং এটি এজন্য যে, আল্লাহ জানেন, বান্দাহর বড় প্রয়োজন আল্লাহকে। আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে; যে বান্দাহকে পথ দেখাতে পারে? হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে পারে? আল্লাহ ব্যতীত কে এমন আছে; যে রিজিক দিতে পারে? নিরাপত্তা দিতে পারে? আসমান যদি খুলে যায়; আর প্রবল বেগে বর্ষণ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত বান্দাহকে বাঁচানোর আর কে আছে? কিংবা সাগর যদি উত্তাল হয়ে উঠে; আর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে যে এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে লাগাম পরায়! কেউ নেই। কারো সাধ্য নেই! এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং এর পরিচালনার সুবিশাল দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন! বড় আফসোস আমরা দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশা চিনি যারা মরে যায়, পচে যায়, মাটির সাথে মিশে যায় অথচ মালিকদের মালিক - মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ কে চিনি না!

অতঃপরঃ এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন,"ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?" ভাইয়ের প্রশ্নটা বেশ ভারী। এত বড় প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সামর্থ্য আমার মত নগণ্যের নাই। তবে প্রশ্নটা আমার পছন্দ হয়েছিলো আলহামদুলিল্লাহ। একই সাথে বেশ কিছুদিন ধরে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা করছিলো। এই দুই মিলিয়ে আজ এই লেখার নিয়্যত করেছি।

১। করোনা ভাইরাস নিয়ে অধমের কিছু চিন্তাঃ

প্রথম যখন আমি এটির ব্যাপারে শুনি তখন আমি এটির দিকে তেমন কোন মনোযোগ দেইনি। এমনকি আমি এটার কোন সংবাদও শুনতাম না, আগ্রহও ছিলো না। এতটুকুই যে খুশি লাগতো আল্লাহর দুশমনেরা মারা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন আমি এটার কোন খবরও দেখিনি। কিন্তু আস্তে আস্তে এমন হতে থাকলো যে, সারা দুনিয়া এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাংলাদেশের দু'আরেও এসে হাজির হল। যা হোক, আমি সে গল্প এখানে বলতে আসিনি, এখন এগুলো সবাই জানেন। আমি করোনার ব্যাপারে যতই দেখলাম, ততই আমার কাছে বিষয়টা খুব অদ্ভুত ঠেকলো। আরো অবাক হলাম যখন দেখলাম এই একই কথা আরো অনেকেই বলছে।

এমন জিনিষ যা কিনা চোখে দেখা যায়না, এই ক্ষুদ্র জিনিষটাই সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিলো, অস্থির করে তুললো। সুপার পাওয়ার দাবি করা রাষ্ট্রগুলো, নিজেদের সভ্যতার প্রতীক দাবি করা ইউরোপ দিনে দুপুরে হাঁটু ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেলো। নিজেদের বিশাল সামরিক বাহিনী, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স সব কিছু নিজ নিজ জায়গায় পড়ে থাকলো, কেউ কিচ্ছু টেরও পেলোনা, সুযোগও পেলোনা, আঘাত করলো এই অদৃশ্য ভাইরাস! এ সব দেখে আমার মনে হলো এটি আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনি ব্যতীত আর কেউই জানে না।

কেনই বা ভাববো না? আপনি লক্ষ্য করেন, আঘাত করার কৌশল আঘাতের তীব্রতা আঘাতের ভয়াবহতা নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে নেয়ার কৌশল কোন একটি নির্দিষ্ট টার্গেট নয় বরং একই সাথে মাল্টিপল টার্গেটকে ধ্বসিয়ে দেয়ার ধরণ ভীতি সৃষ্টি করার নমুনা প্রভাব বিস্তার করার উদাহরণ দিনে দুপুরে কিভাবে শত্রুপক্ষকে তার সমস্ত শক্তিকে কচু দেখিয়ে, শত্রুপক্ষের সমস্ত উপকরণ, সৈন্য-সামন্তের সামনে দিয়ে এমন আক্রমণ - তা শুধু আল্লাহর সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব!

দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তিগুলোর শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে, নিজেদের জায়ান্ট ইকোনমি দাবি করা রাষ্ট্রগুলোর ইকোনমির দফা রফা করে দিয়েছে, সভ্য দাবি করা এই সমাজের সমস্ত ঠুনকো মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের ভিতরের স্বার্থপরতা বের করে দিয়েছে। এমন কোন সেক্টর নাই যেখানে আঘাত করেনি এই বাহিনী! সামরিক, অর্থনৈতিক, পোশাক শিল্প, জনসম্পদ, টেকনোলজি, ট্যুরিজম, জঘন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, জুয়ার জগত, খেলাধুলা কোন কিছুই বাদ নাই! এ সমস্ত কিছু দেখে শুধু একটা কথাই মনে আসে আর তা হচ্ছে, এ হচ্ছে সামান্য এক ভাইরাস যা আল্লাহর হুকুমে কাজ করে যাচ্ছে। সামান্য ভাইরাসই যদি এই অবস্থা করতে পারে, তাহলে কি হবে যদি আল্লাহ এক প্রবল হুংকার দেন! কি অদ্ভুত, এত কিছুর পরেও আমরা আল্লাহর মুকাবেলায় নিজেদের দাঁড় করিয়ে নেই! আল্লাহকে পরিত্যাগ করে এসব কীটপতঙ্গের মত নগণ্য মানুষকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে নেই!

২।"ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

উপরের আলোচনা করার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো যেন এই প্রশ্নের উত্তর কিছুটা সহজ হয়। নিঃসন্দেহে করোনা ভাইরাস আমাদের জন্য সতর্কবার্তা। যারা এখান থেকে সাবধান হয়ে যাবে তাদের জন্য এটি সফলতা, আর যারা নিজেদের শুধরে নিবে না তারা আসলে ধ্বংসের উপরে আরো ধ্বংস চাপিয়ে নিলো। করোনা ভাইরাসের এই সংকট কালে কোন কাজটি সবচেয়ে ভয়াবহ? বাজারে যাওয়া? মাস্ক না পরা? বার বার সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া? নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা? - না এগুলো কোনটাই না। বরং সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে, এমন কঠিন আযাবের সময়েও পাপে ডুবে থাকা, পাপ থেকে সরে না আসা। আল্লাহর কদর অনুযায়ী কোন একটি কাজ একেক জনের জন্য একেক উদ্দেশ্য পূরণ করে, কারো জন্য যদি আযাব হয়, কারো জন্য হেদায়েতের কারণও হয়। বিশ্বাসীদের জন্য, বালা মুসিবতের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য যে সে পাপের পথ থেকে ফিরে আসবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

'তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, প্রতিবছর তাদের উপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এরপরও ওরা তওবা করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না।' (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসে এসেছে, দুর্যোগ বা এমন মহামারী'র সময়ে যে নিজেকে সংশোধন করে নিলোনা বরং পাপের উপরেই অটল থাকলো সে প্রকৃত অর্থেই ধ্বংস হয়ে গেছে! তাই করোনা সময়ে মু'মিনের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদের কথা, সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া নয়, বরং পাপ থেকে ফিরে না আসা, পাপ পরিত্যাগ না করা, তাওবাহ না করা। দেখেন, মহামারী আসার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে - ব্যাপকহারে অশ্লীলতার প্রচার। এখন মহামারীর মধ্যে বসে থেক দিন রাত সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কেউ যদি অশ্লীলতা থেকে না বের হয়ে আসে তবে কি আশা করা যায়! আমি, আপনি দিনে ১০০ বার স্যানিটাইযার দিয়ে হাত পরিষ্কার করলেন, কিন্তু আমাদের চোখ অশ্লীল দৃশ্য থেকে সরলো না, তাহলে নিশ্চিত থাকেন, আমরা করোনা সংক্রমণ অপেক্ষা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছি! সূরা আন'আমের ৩ টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ এই সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে কতই না পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন! আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করে। [সূরা আন'আম ৬:৪২]

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন তারা নম্রতা এবং বিনয় প্রকাশ করলোনা ? বরং তাদের অন্তর আরো কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। [সূরা আন'আম ৬:৪৩]

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। [সূরা আন'আম ৬:৪৪]

আল্লাহ আগের জাতির কথা উল্লেখ করে বলছেন, তারা যখন নবী রাসূল প্রেরণের পরেও অবাধ্য হয়েই যাচ্ছিলো, তখন আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ, মহামারী দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন, যেন তারা বাধ্য এবং অনুগত হয়। অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরে আসে। অতঃপর আল্লাহ জানাচ্ছেন তাদের অবস্থাটা কেমন হয়েছিলো। তারা না নতি স্বীকার করেছিলো, না তারা তাদের পাপ পরিত্যাগ করেছিলো। বরং এই বিপদের মধ্যেও শয়তান তাদের পাপ কাজগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখাচ্ছিলো যেন তারা এই পাপ আরো বেশি, বেশি করে করতে থাকে। এতে করে তাদের অন্তর আরো কঠিন হয়ে গেলো এবং সব শেষে তাদের পরিণতি কি হয়েছিলো? আল্লাহ আবার তাদেরকে আরো কঠিন এক পাকড়াও করলেন, চূড়ান্ত আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন এবং তারা সেই অবাধ্যতার উপরেই ধ্বংস হয়ে জাহান্নাম নিশ্চিত করে নিলো! আমরা ভেবে দেখি আমাদের অবস্থা এমন কিনা?

কিছুদিন আগে নিউজে দেখলাম যে, ঘরে থাকার এই সময়ে নোংরা ফিল্ম জগতের কোন এক প্রতিষ্ঠান তাদের দর্শকদের জন্য নোংরা ছবি দেখার সাবস্ক্রিপশন ফ্রি করে দিচ্ছে! চিন্তা করা যায়! তাহলে প্রশ্নটিতে ফিরে আসি - "ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?" সবার আগে আমরা পাপ পরিত্যাগ করা এবং তাওবাহ এর দাওয়াত নিয়ে কাজ করতে পারি ইনশা আল্লাহ। এরপরে তাওহিদের দাওয়াত দিতে পারি, আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি ইনশা আল্লাহ। এই কঠিন অবস্থায় মানুষ কিছু আশা চায়, ভরসা চায়। তাদেরকে আল্লাহর দিকে নির্দেশ করে দেয়া, একমাত্র আশা ভরসার স্থান চিনিয়ে দেয়া। কিভাবে মানুষের উপরে রব সেজে বসে থাকা এই সিস্টেম এই তাগুতরা আজ মানুষের কোন উপকারই করতে পারছে না, তা দেখিয়ে দেয়া। প্রকৃত অর্থে এটা কতবড় প্রতারণা, কতবড় ছলনা তা জানিয়ে দেয়া! তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর দিকে বিনীতভাবে ফিরে আসার আহবান জানানো। এটি স্মরণ করিয়ে দেয়া, সামান্য করোনা সংকটে এই তাগুতি সমাজ ব্যবস্থা আজ এত অসহায়, তাহলে আল্লাহর সামনে যেদিন সবাই দাঁড়িয়ে যাবে সেদিন তারা আমাদের কি উপকারে আসবে? তাহলে কেন আমরা আল্লাহকে ছেড়ে এই তাগুতদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলাম? বাস্তবে তারা তো নিতান্তই অসহায়! সামান্য এক ভাইরাস যা চোখেই দেখা যায় না এত ক্ষুদ্র, এমন কিছুর মোকাবেলায় যদি তারা আমাদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে এটা কিভাবে মেনে নেয়া সম্ভব যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে? তাহলে কেন আজ আমরা আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করে তাদের নির্দেশনা মেনে চলব? আমাদের ভালো মন্দের উপরে তাদের কি কচু অধিকার? তারা নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, স্বার্থলোভী শয়তানের আউলিয়া ছাড়া আর কিছুই না!

একই সাথে এই জঘন্য পাপে ডুবে থাকা সমাজব্যবস্থার আসল চিত্র দেখিয়ে দেয়া। কুরআন এবং সুন্নাহ'র আলোকে বর্তমান দুর্দশার কারণ দেখিয়ে দেয়া। দেখিয়ে দেয়া কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহামারীর কারণসমূহ উল্লেখ করে গেছেন আর সেই সমস্ত কারণগুলোই এই সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০১৯)

আজ কি আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা এই কাজটিই করছে না? দেখিয়ে দিন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে। অধিকাংশই আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ এর জীবন্ত সান্নিধ্য বঞ্চিত, এই সুযোগে সাধ্যমত কুরআন এবং সুন্নাহকে অন্যদের সামনে জীবন্তভাবে পেশ করার চেষ্টা করেন, ইনশা আল্লাহ। একই সাথে সামনের দিনের অনাগত ফিতান সম্পর্কে এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে যাওয়া বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। জানান এই ফিতানের পড়ে বরং ঢেউ এর মত এর চেয়ে আরো ভয়ংকর ফিতান আসবে, আসতেই থাকবে। আর সেই ফিতানের মুকাবেলায় শুধুমাত্র ঈমানই কাজে আসবে, অন্য কিছু নয়। তাই সেই ফিতানের প্রবল তোড় আসার আগেই আমরা যেন ঈমান মেরামত করে নেই। নিশ্চয়ই দাওয়াতের পরিধি অনেক বিশাল, সামান্য ক' লাইনে তা তুলে ধরা অধমের পক্ষে সম্ভব না। তবে

অবশ্যই দাওয়াতি কাজের প্রথম লক্ষ্য থাকা উচিৎ, বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত এবং তাগুতকে অস্বীকার করার দাওয়াত। কুরআন এবং সুন্নাহ এর সাথে পরিচিত হবার দাওয়াত।

৩। শেষ কথাঃ

এই ফোরামে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভাই আছেন। আল্লাহ যাদের সামনে এই লেখাটি উপস্থাপন করবেন, তাদের মধ্যে থেকে ১ জন ভাই কমপক্ষে ১ জন ভাই এর কাছে এই দাওয়াত দিতে পারেন, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেয়ার তাকে হেদায়েত দিবেনই। কেমন হয় যদি এই সমস্ত হেদায়েতের কাজ এবং এর সাওয়াব আল্লাহ আপনার জন্যই বরাদ্দ করে দিবেন! হতেই পারে আল্লাহ আপনাকেই এ কাজের জন্য পছন্দ করে রেখেছেন, শুধু আপনার কদম উঠানোর অপেক্ষা।

পরিশেষে, করোনা নিয়ে সতর্ক হবার দরকার আছে কারণ তা সুন্নাহ। তবে করোনা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নাই। ভয় তো শুধু আল্লাহর জন্য। করোনা যদি আমাদের সংক্রমণ না করে আর আমরা যদি আল্লাহর নিকট তাওবা করতে থাকি, আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে আশ্রয় চাইতেই থাকি তাতেও আমাদের লাভ। করোনা যদি আমাদের সংক্রমিত করে আর আমরা যদি সবর করি, ইবাদতে মশগুল থাকি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন এমন কাজ রাসুলের দিকে হিজরত করার মত সাওয়াব! আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যদি সবরের সাথে করোনা সংক্রমিত হয়ে মারা যাই, তাহলে শহিদ ইনশা আল্লাহ! আমাদের ক্ষতি কোথায়? আমরা শুধু ক্ষতি আর ভয় এজন্য দেখি কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এই মহামারির দিকে যেভাবে তাকাতে বলেছেন; আমরা সেভাবে তাকাইনা, বরং শয়তানের আউলিয়ারা আমাদের যেভাবে তাকাতে বলে সেভাবে তাকাই, আর সেজন্যই আমরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করি। কারণ, নিরাপত্তা তো শুধুই আল্লাহর কাছে। তাই –فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ ...

সুপার পাওয়ার দাবি করা রাষ্ট্রগুলো, নিজেদের সভ্যতার প্রতীক দাবি করা ইউরোপ দিনে দুপুরে হাঁটু ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেলো। নিজেদের বিশাল সামরিক বাহিনী, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স সব কিছু নিজ নিজ জায়গায় পড়ে থাকলো, কেউ কিচ্ছু টেরও পেলোনা, সুযোগও পেলোনা, আঘাত করলো এই অদৃশ্য ভাইরাস! এ সব দেখে আমার মনে হলো এটি আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনি ব্যতিত আর কেউই জানে না। কেনই বা ভাববো না? আপনি লক্ষ্য করেন, আঘাত করার কৌশল আঘাতের তীব্রতা আঘাতের ভয়াবহতা নিজেকে প্রতিনয়ত পরিবর্তন করে নেয়ার কৌশল কোন একটি নির্দিষ্ট টার্গেট নয় বরং একই সাথে মাল্টিপল টার্গেটকে ধ্বসিয়ে দেয়ার ধরণ ভীতি সৃষ্টি করার নমুনা প্রভাব বিস্তার করার উদাহরণ দিনে দুপুরে কিভাবে শত্রুপক্ষকে তার সমস্ত শক্তিকে কচু দেখিয়ে, শত্রুপক্ষের সমস্ত উপকরণ, সৈন্য-সামন্তের সামনে দিয়ে এমন আক্রমণ - তা শুধু আল্লাহর সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব!

দ্বীনি ভাইদের প্রতি এক মুহাজিরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহাহ

Masum Shariar

শেষ নসিহত হিসেবে আর কী বলবো। আমাদের একজন খালিক আছেন, তাঁর নাম আল্লাহ। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদেরকে তাঁরই ইবাদত করতে হবে। তাঁর নির্দেশই আমাদের মানতে হবে। তাঁর নিষেধগুলো থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, হোক সেটা কষ্টের অথবা শান্তির। সর্বহালতেই তাঁরই কথামত চলতে হবে। আর তাঁর কথামত চলতে গিয়ে যদি আমাদের উপর কষ্ট আসে, বিপদ আসে, তাহলে সেটা তো আল্লাহরই জন্যে। আমাকে বিপদ দেওয়ার মালিকও আল্লাহ, বিপদ থেকে উদ্ধার করার মালিকও আল্লাহ। আল্লাহ যদি আমাকে বিপদ দিতে চান, তাহলে তো এটা আমার জন্য সৌভাগ্য যে, আল্লাহ আমাকে বিপদ দিয়ে পরকালের পুরস্কারের ব্যবস্থা করার ফিকির করেছেন, গোনাহ মাফ করার ব্যবস্থা করেছেন।

মায়ের কথা মনে পড়ে। দুঃখিনী মা-ও হয়তো আমার কথা মনে করে নীরবে অশ্রু ফেলছেন। জীবিত থেকেও আজ আমি মায়ের কাছে হয়তো মৃতের মত। তারপরও তো মায়ের পাশে তাঁর অন্য সন্তানরা আছেন, বাবা আছেন, আত্মীয়স্বজন-পরিজন আছেন। কিন্তু আমার? এক আল্লাহ ছাড়া তো আর প্রিয় কেউ পাশে নেই! মা-বাবা, পরিজনেরা হয়তো আমাকে কিছুদিন পরেই ভুলে যাবেন, সকলের মাঝে অবস্থানের কারণে হয়তো তাঁরা আমার অনুপস্থিতি খুব একটা টেরই পাবেন না। কিন্তু আমি? গৃহ-পরিবার ছেড়ে একাকী আমি কি ভুলতে পারি তাঁদের? না ভাই, তাঁদের পদচারণা আমার কানে এখনো বাজে। এখনো তাঁদের সুমধুর কণ্ঠের ডাক প্রতিধ্বনিত হয় আমার কানে। তাঁদের স্মৃতি আমাকে ব্যস্ত করে তোলে, চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাহলে, আজ আমি বাড়ি থেকে দূরে অবস্থানের কারণ? আল্লাহর হুকুম, আমার রবের নির্দেশ। মায়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকতে না পারার বেদনা বয়ে বেড়াই। কিন্তু, যে আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন, সে আল্লাহ তো আমার মা-কেও বানিয়েছেন। আল্লাহ তো একজনই। যে আল্লাহ আমাকে দেখা-শোনা করছেন, সে আল্লাহ তো আমার মা-কেও দেখা-শোনা করছেন। আর, এই মুহূর্তে তো আমি মায়ের খেদমত বা মায়ের হকের, মুহাব্বাতের উসিলা দিয়ে আমার খালেকের অবাধ্যতা করতে পারি না। আল্লাহ আমাদের মনগুলোকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত করে দিক, (জান্নাতকে আমাদের মিলনস্থল বানাক) এমনভাবে প্রস্তুত করে দিক যে, আল্লাহর নির্দেশের মোকাবেলায় যেন সবকিছুই তুচ্ছ থাকে, আমীন। আমি আপনাকে একটি বিষয় বলতে চাই। সেটা হলো- যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন কিন্তু মাতাপিতার হক্কের উপর ফরজ জিহাদ প্রাধান্য পাবে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, এখন জিহাদ ফরজে আইন। যদিও আমরা কোনো ক্ষেত্র এখনো তৈরি করতে পারিনি। তবে, হুকুম কিন্তু সেটাই। তাই, আপনাকে বলছি, আপনি দুনিয়ার এই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একমাত্র দ্বীনের কাজে কীভাবে মনোনিবেশ করা যায়, সেই ফিকির করুন। আর আমলের ব্যাপারে বলবো যে, সম্ভব হলে বিয়ে করে ফেলুন। তবে, বিয়ের আগে ভেবে-চিন্তে বিয়ে করুন, যাতে আহলিয়াকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা যায় এবং আহলিয়াকে এমন মনমানসিকতায় গড়ে তুলবেন যে, আমি চলে গেলে তোমার কোনো ক্ষতি নাই। আমার পরে আমার মত কোনো একজন তোমাকে বিয়ে করে নিতে পারবে। তাহলে আহলিয়া আপনাকে আপনার কাজে বাধা দিবেনা আশা করি ইনশাআল্লাহ। আমাদের সমাজের সমস্যাটা এখানেই; মেয়েরা মনে করে যে, আমার স্বামী মরে গেলে পরে আমি সারা জীবন বিধবা থাকতে হবে, আমি কীভাবে চলবো তাহলে?

তাই তারা স্বামীকে জিহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের বোনদেরকে যেমন এই মনমানসিকতার বানাতে হবে, ঠিক আমাদেরও এমন মনমানসিকতার হতে হবে যে, কোনো ভাই মারা গেলে তাঁর বিধবা আহলিয়াকে বিয়ে করে ফেলা। তাহলে আমাদের বোনেরা স্বামীদেরকে জিহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করবেনা, ইনশাআল্লাহ।

আর বিয়ে করার পর প্রাথমিকভাবে মনে হয় নিজেকে নিজের উপর একটু কঠিন রাখতে হবে। যাতে কোনোভাবে আগে চেয়ে দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে কমতি না আসে। এই ধাক্কা সামলাতে পারলে আশা করা যায়, এগিয়ে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর, চেষ্টা করুন পারিবারিক ঝামেলা কম এমন পরিবারে বিয়ে করতে। যেমন- আপনি বিয়ে করে কোথাও বাসা নিয়ে থাকলেন, বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি ঝামেলা কম থাকে এমন পরিবারে বিয়ে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

সম্ভব হলে বিয়ে করে ফেলুন। তবে, বিয়ের আগে ভেবে-চিন্তে বিয়ে করুন, যাতে আহলিয়াকে হিজরতের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা যায় এবং আহলিয়াকে এমন মনমানসিকতায় গড়ে তুলবেন যে, আমি চলে গেলে তোমার কোনো ক্ষতি নাই। আমার পরে আমার মত কোনো একজন তোমাকে বিয়ে করে নিতে পারবে।

> অন্যান্য ভাইদের প্রতি আপনার কী নসিহাহ ভাই?

সাধারণভাবে সকল ভাইদের প্রতি কিছু নসিহাহ হলো-

১. দ্বীনের উপর খুব কষ্ট করে হলেও টিকে থাকা, মানে ইস্তিকামাত। এটা যতো কষ্ট হোক, যতো বিপদের মাঝেই হোক, অ্যাক্টিভিটির সাথে লেগে থাকা।

২. গোনাহ থেকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা।

৩. দ্বীনের কাজে কমতি আসে এমন দুনিয়াবি সব কাজকে পেছনে ফেলে দেওয়া, ত্যাগ করা।

৪. আল্লাহর মুহাব্বাত দিলের মধ্যে গেড়ে দেওয়া, যে মুহাব্বাত আল্লাহর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে বাধ্য করে।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনভাবে মুহাব্বাত করা, যে মুহাব্বাত তাঁর অনুসরণ করা থেকে শুরু করে তাঁর জন্য জীবন দিতে বাধ্য করে। এগুলো আসলে একদিনে হয়না। এইগুলোর জন্য ফরজ, ওয়াজিব, নফল, সবকিছু আদায় করে, সুন্নাত অনুসারে জীবন পরিচালনা করে করে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা এটা করার সর্বপ্রথম আমাকে তাওফিক দান করুন, আমীন। এর পর বাকি সকল ভাইকে তাওফিক দান করুন।

আরেকটি বিষয় আমি ভাইদের উদ্দেশ্যে বলবো। সেটি হলো তাহাজ্জুদ। আল্লাহর মুহাব্বাত লাভের অন্যতম উপায় হলো তাহাজ্জুদ। আত্মার অনেক রোগের ঔষধও মনে করি এটি। অনেক ভাইদের দেখা যায়, ফরজ আমল করতেও অলসতা লাগে, অবহেলা করে। তাদের জন্যও তাহাজ্জুদটা লাজেম (আবশ্যক) করে নেওয়া এটা একটা কার্যকরী ঔষধ বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ সহজ করুন, আমীন। সর্বশেষ বলবো, যে শাহাদাত পেতে চায়, সে যেন ভোর রাতে তাহাজ্জুদে আল্লাহর কাছে সেটা চায়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এবং সবাইকে এই আমলটি সারা জীবন ধারাবাহিকভাবে করে যাওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

কমেন্ট

Talhah Bin Ubaidullah

আল্লাহ রব্বুল আলামিন প্রিয় ভাইকে কবুল করে নিন, আমাদেরকে আল্লাহর পথে অবিচল রাখুন, আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন, জান্নাতকে আমাদের মিলনস্থল বানান, আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন। ভাইয়েরা, হযরত উমার (রদিঃ) দুয়া করতেন,

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মারঝুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়া জাআল মাওতি ফি বালাদি রসুলিকা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পথে শাহাদাত দান করুন এবং আমাকে আপনার রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে (মদিনা) মৃত্যু দিন। (সহিহ বুখারি, হাদিস ১৮৯০) আমরা এই দুয়াটি মুখস্থ করে ফেলি এবং এই দুয়া বেশি বেশি করি।

করোনা সংক্রমণে "আতংকিত নয়, সচেতন হোন"

খালিদ মুন্তাসির

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার আতংকে আছেন? এতো আতংক কীসের? আপনি মুসলিম না? মুসলিমদের এই মহামারী নিয়ে আতংকিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। আতংকিত নয়, সচেতন হওয়াই কাম্য। এটা আমি যেমন আজ আপনাদের বলছি, তেমনি নাস্তিক্যবাদীরাও বলছে। পার্থক্য কোথায়? তারা মানুষকে বলছে, ভয় পাবেন না, সচেতন থাকুন। আচ্ছা, ভয় পাবে না কেন? রোগাক্রান্ত হলে কষ্ট পায়, মৃত্যু হতে পারে—এগুলো জানার পরও একজন মানুষের ভয় না পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? নাস্তিক্যবাদীরা এগুলোর ব্যাখ্যা তো করেইনি, বরং তাদের কথা হলো- আপনারা আক্রান্ত হলেও ঘরেই থাকুন, হাসপাতালে যাবেন না, ভয় পাবেন না, অন্যদেরকে আক্রান্ত করবেন না ইত্যাদি। ধর্ষণসহ অন্যান্য সকল অপরাধ রোধের ক্ষেত্রেও এই নাস্তিক্যবাদীরা এই ধরণের 'স্ববিরোধী' কথা বলে থাকে। তারা বলে, ধর্ষণ করবেন না, চুরি করবেন না। কিন্তু, কেন করবে না? ধর্ষণ না করার দ্বারা কী লাভ? যারা আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, তারা কোনো মেয়েকে ধর্ষণের সুযোগ পেলে কী কারণে ধর্ষণের সুযোগ হাতছাড়া করবে? কেন মানবতা দেখাতে হবে? মানবতা না দেখালে কী ক্ষতি? দুনিয়া অর্জনই যার উদ্দেশ্য, সে কেন দুনিয়ার কোনো ভোগের বস্তুকে ছেড়ে দিবে? এগুলোর কোনো কিছুই এই নাস্তিক্যবাদীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। ঠিক তেমনি করোনাভাইরাসের মহামারী প্রতিরোধে নাস্তিক্যবাদী সরকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তো নেয়নি, আবার বলছে আতংকিত হবেন না! মানুষ মারা যাচ্ছে, রোগাক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে—তারপরও আতংকিত না হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? এই প্রশ্নের সদুত্তর নাস্তিক্যবাদীরা দিতে না পারলেও, ইসলাম এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেছে। একজন মুসলিম রোগাক্রান্ত হলে বা মহামারীতে মারা যাওয়ার আশংকা হলেও কেন ভয় পাওয়া উচিত নয়—এই বিষয়ে ইসলাম কথা বলেছে। ইসলাম বলছে, রোগাক্রান্ত হলে একজন মুসলিমের উচিত ধৈর্যধারণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা। এতে, তার কী লাভ? তার লাভ হলো- তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

الْمَرِيضُ تَحَاتَّ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ.

অসুস্থ ব্যক্তির গোনাহগুলো ঝরে যায়, যেমন (শীতকালে) গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬৫৪)

আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

কোনো মুসলিম যখন অসুস্থতা বা অন্য কোনো কষ্টে নিপতিত হয় আল্লাহ তার গোনাহগুলো মিটিয়ে (ঝরিয়ে) দেন, যেমন (শীতকালে) গাছ তার পাতা ঝরায়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৭১)

শুধু গোনাহমাফিই নয়, মুমিনের নেকীর খাতাও সমৃদ্ধ হতে থাকে অসুস্থ অবস্থায়; যাতে আফসোস করতে না হয়- অসুস্থতার কারণে আমি কত নেক আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, সুস্থ থাকলে তো আমি তাহাজ্জুদ-তিলাওয়াতসহ অন্যান্য নেক আমল করতে পারতাম। এখন তো কিছুই করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন-

إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.

যখন বান্দা অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে তখন সুস্থ অবস্থায় বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় সে যে নেক আমল করত তার সওয়াব লেখা হতে থাকে (যদিও অসুস্থতা বা সফরের কারণে সে উক্ত নেক আমলগুলো করতে পারছে না)। -(সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৯৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৬৭৯)

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ উম্মুস সায়েব বা (তার নাম ছিল) উম্মুল মুসায়্যিবকে দেখতে গেলেন। তখন তিনি জ্বরে কাঁপছিলেন। নবীজী বললেন, তুমি কাঁপছো কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল! জ্বর এসেছে। এবং বললেন, 'লা- বারাকাল্লাহু ফী-হা' অর্থাৎ সে জ্বরের জন্য বদদুআ করল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

لَا تَسُبِّي الْحُمّى، فَإِنّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

(বদদুআর মাধ্যমে) জ্বরকে গালি দিয়ো না। কারণ, তা বনী আদমের গোনাহগুলো মিটিয়ে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার জং দূর করে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৭৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৯৩৮; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৩৭৯)

অর্থাৎ, হাদিসসমূহ থেকে বুঝা গেল যে, মুমিনের রোগ-শোকের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করেন। গোনাহ ক্ষমা করলে একজন মুসলিমের কী লাভ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেক মুসলিম জানে। গোনাহ মুসলিমকে অস্বস্তি দেয়, নিজের কৃত গোনাহ নিয়ে একজন মুসলিম দুশ্চিন্তায় থাকে—না জানি এ গোনাহ তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়। আর, যখন সে জানতে পারে যে, অসুস্থতার মাধ্যমে তার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তখন সে কেন খুশি হবে না? অবশ্যই একজন মুসলিম তার গোনাহ ক্ষমা হলে খুশি হয়। এজন্য, অসুস্থতাবস্থায় কোনো মুসলিম আতংকিত তো হবেই না, বরং রোগের কারণে বাহ্যিক কষ্ট হলেও সে তার গোনাহসমূহ মাফ পাওয়ায় মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকবে, অন্তরে আনন্দ থাকবে।

এখন কথা হলো, করোনাভাইরাসের মতো এরকম কোনো মহামারীতে তো কেবল রোগাক্রান্তই হচ্ছে না, মারাও যাচ্ছে। তাহলে, একজন ব্যক্তি যখন জানে যে, সে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে, তখনও কেন সে আতংকগ্রস্ত হবে না? যারা দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়াকেই সবকিছু মনে করে, এখানের ভোগই যাদের উদ্দেশ্য, যে তার দুনিয়া গুছিয়েছে, সে তো তার এই গুছানো দুনিয়া ছেড়ে যেতে চাইবেই না। তাই, স্বাভাবিকভাবেই সে মৃত্যুর কথা শুনে আতংকিত হবে, নাস্তিক্যবাদীদের "আতংকিত হবেন না, সচেতন হোন" ধরণের বুলি তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। রোগ থেকে মুক্তির জন্য তার ভরসাস্থল ছিল ঔষধ। কিন্তু, করোনাভাইরাস নিরাময়ের তো কোনো ঔষধ বের হয়নি! সে আর কার উপর ভরসা করবে? নাস্তিক্যবাদী মিডিয়া 'প্রথম আলো'ও এই কথাই বলছে, "এই রোগ নিয়ে এত আতঙ্কের কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত এর কোনো টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি।"

আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের:

(ক) তাউনে (মহামারীতে) মৃত ব্যক্তি শহীদ,

(খ) যে ডুবে মারা যায় সে শহীদ,

(গ) নিউমোনিয়া রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ,

(ঘ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ,

(ঙ) যে পুড়ে মারা যায় সে শহীদ,

(চ) কোন কিছু চাপা পড়ে যে মারা গেছে সে শহীদ,

(ছ) আন্তঃসত্ত্বায় মৃত মহিলা শহীদ।

পক্ষান্তরে, আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী কোনো মুসলিম মৃত্যুকে ভয় পায় না, মৃত্যুর কথা শুনে আতংকিত হয় না। কারণ, দুনিয়াকে তারা চিরস্থায়ী আবাস মনে করে না, ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার জীবন কোনো মতে অতিবাহিত করে, রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরস্থায়ী আখিরাতই তাদের কাম্য। দুনিয়াতে তাদের কাজ ভোগে মত্ত থাকা নয়, বরং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা। অর্থাৎ, তারা আখিরাত গুছায়। তাই, কষ্টের দুনিয়া ছেড়ে স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের গুছানো জায়গায় যেতে চায়। তাছাড়া, তারা আখিরাতে তাদের রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, রবের প্রতিশ্রুত জান্নাতের প্রত্যাশী। আর, মৃত্যু তাদের এই সকল প্রত্যাশার পথে প্রধান বাধা। তাই, তারা মৃত্যুকে ভয় তো পায়ই না, বরং রবের সন্তুষ্টির উপর মৃত্যুবরণ করাকে নিজেদের সফলতা হিসেবে দেখে।

আর, করোনাভাইরাসের মতো মহামারীতে মৃত্যুবরণ করাকে ভয় না পাওয়ার আরেকটি বিশেষ কারণ হলো- এই সকল মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা মুসলিম শহীদের সমান সওয়াব পায়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ.

আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের: (ক) তাউনে (মহামারীতে) মৃত ব্যক্তি শহীদ, (খ) যে ডুবে মারা যায় সে শহীদ, (গ) নিউমোনিয়া রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, (ঘ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, (ঙ) যে পুড়ে মারা যায় সে শহীদ, (চ) কোন কিছু চাপা পড়ে যে মারা গেছে সে শহীদ, (ছ) আন্তঃসত্ত্বায় মৃত মহিলা শহীদ। (আবূ দাঊদ ৩১১১, নাসাঈ ১৮৪৬)

এতো সব পুরস্কারের ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও কোনো মুসলিম করোনাভাইরাসের কারণে আতংকিত হবে—এটা ভাবা যায় না। স্বাভাবিকভাবেই, একজন মুসলিম রোগ-শোক তথা কোনো বিপদে আতংকিত না হয়ে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহর উপর ভরসা করবে। পাশাপাশি, সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা, সতর্কতা অবলম্বনও একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য, ইসলামের নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"কোন এলাকায় তোমরা মহামারীর সংবাদ শ্রবণ করলে সেখানে প্রবেশ করবে না। আর কোনো এলাকায় থাকা অবস্থায় যদি মহামারী শুরু হয়, তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না"। (বুখারী হাদিস ৫৭২৯, মুসলিম হাদিস ৫৯১৫)

সুতরাং, করোনাভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপারে মুসলিমরা আতংকিত হবে না, সতর্ক হবে। তবে, এখন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমি কি সত্যিই মুসলিম হতে পেরেছি? নিজের জীবনকে কতটুকু ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করছি? প্রিয়! এখনও কি রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় হৃদয়ে ঢুকেনি? দুচোখের অশ্রু ফেলে মালিকের কাছে তওবা করার সময় কি তবুও আসেনি? আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুন, আমাদেরকে করোনাভাইরাসের মহামারী থেকে হেফাজতে রাখুন। অসুস্থ মুসলিমদের সুস্থতা দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মহামারী ও সঙ্কটময় মুহূর্তের কিছু আমল

Abu Ahmad

তিন মাস হতে চলল এখনো করোনা ভাইরাসের কোনো প্রতিষেধক তৈরি হয়নি। আগামী কতদিনের মধ্যে হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদিও ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এ থেকে বেঁচে থাকার কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় এবং এটা নিরাপত্তারও কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে আমরা যারা মুসলিম, তাদের জন্য হাদিসে বর্ণিত এমন কিছু দুআ ও আমল আছে, যা অনুসরণ করলে আশা করা যায় আল্লাহ এ বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। এগুলো যে কেবল করোনা ভাইরাসকেই রোধ করবে তা নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছায় অন্যান্য বালা-মুসিবতও দূর করবে। দুআ ও আমলগুলো সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করছি :

১. বিভিন্ন রোগ-বালা থেকে বেঁচে থাকার জন্য হাদিসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দুআটি বারবার পড়তে থাকুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ، وَالجُنُونِ، وَالجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়া মিন সাইয়িইল আসকাম) সূত্র : সহিহু ইবনি হিব্বান : ১০১৭, সুনানু আবি দাউদ : ১৫৫৪, মুসনাদু আহমাদ : ১৩০০৪

২. করোনাক্রান্ত বা অন্য কোনো বিপদে নিপতিত ব্যক্তিকে দেখলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন; তাহলে জীবনে কখনো সে রোগ বা বিপদে নিপতিত হবেন না।

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

(আল-হামদু লিল্লাহিল্লাজি আ'ফানি মিম্মাবতালাকা বিহি ওয়া ফাজ্জালানি আলা কাসিরিম মিম্মান খালাকা তাফজিলা) সূত্র : সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৩১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৯২,

৩. হাসপাতাল, কারও বাসা কিংবা অন্য কোথাও গেলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন; ইনশাআল্লাহ সেখানে থাকাকালীন কোনো বিপদে আক্রান্ত হবেন না।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা) সূত্র : সহিহু মুসলিম : ২৭০৮, সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৩৭, সুনানুন নাসায়ি, কুবরা : ১০৩১৮

৪. প্রত্যহ সকাল-বিকাল তিনবার করে নিম্নোক্ত দুআটি পড়ুন; ইনশাআল্লাহ সেদিন আপনি আকস্মিক কোনো ক্ষতি বা বিপদে নিপতিত হবেন না।

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াজুররু মাআসমিহি শাইয়ুন ফিল আরজি ওয়ালা ফিস সামায়ি ওয়াহুয়াস সামিউল আলিম) সূত্র : সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮৮, সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৮৮, মুসনাদু আহমাদ : ৫২৮

৫. দুআ ইউনুস বেশি বেশি করে পড়ুন এবং আল্লাহর কাছে বিপদ ও মহামারীতে আক্রান্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এটা পড়ে দুআ করলে আল্লাহ অবশ্যই তার দুআ কবুল করেন।

দুআ ইউনুস : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন) সূত্র : সুনানুত তিরমিজি : ৩৫০৫, মুসনাদু আহমাদ : ১৪৬২

৬. অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করতে থাকুন। প্রসিদ্ধ ইসতিগফারও পড়তে পারেন, সাইয়িদুল ইসতিগফারও পড়তে পারেন। তবে সাইয়িদুল ইসতিগফারই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

প্রসিদ্ধ ইসতিগফার :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

(আসতাগফিরুল্লাহাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুমু ওয়া আতুবু ইলাইহি।) সূত্র : সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৭, মুসনাদু আহমাদ : ১১০৭৪

সাইয়িদুল ইসতিগফার : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ লাকা বিজামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা) সূত্র : সহিহুল বুখারি : ৬৩০৬, সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৯৩

৭. প্রচুর পরিমাণে নিম্নোক্ত দুআটি পড়তে থাকুন। সকল বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটা খুবই কার্যকর একটি দুআ।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিকা ওয়া জামিয়ি সাখাতিকা) সূত্র : সহিহু মুসলিম : ২৭৩৯

৮. সকাল-বিকাল নিম্নোক্ত দুআটি একবার করে পড়ুন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দিনি ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া আহলি ওয়া মালি, আল্লাহুম্মাসতুর আউরাতি ওয়া আমিন রাউআতি, আল্লাহুম্মাহফাজনি মিম বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফি ওয়া আন ইয়ামিনি ওয়া আন শিমালি ওয়া মিন ফাউকি ওয়া আউজু বিআজামাতিকা আন আগতালা মিন তাহতি) সূত্র : সুনানু আবি দাউদ : ৫০৭৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৭১

৯. সকাল-বিকাল তিনবার করে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ুন। ইনশাআল্লাহ সকল কিছুর জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সুরা ইখলাস :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সুরা ফালাক :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সুরা নাস :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ، الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

সূত্র : সুনানু আবি দাউদ : ৫০৮২, সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৭৫

১০. সকল প্রকার গুনাহ ও নাফরমানি পরিত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন এবং দান-সাদাকা বৃদ্ধি করুন। কেননা দান-সাদাকা বিপদাপদ দূর করে দেয়।

এগুলো সবই বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে প্রমাণিত। আল্লাহর ওপর স্থির বিশ্বাস রাখুন; এবং সুন্নাহ হিসেবে এসব দুআর পাশাপাশি ডাক্তারি নির্দেশনাগুলোও মেনে চলুন। তাকদিরে মৃত্যু লেখা না থাকলে ইনশাআল্লাহ এতে আপনি সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। বিশুদ্ধ সুন্নাহ জানুন, সুন্নাহর ওপর আমল করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

সাইয়িদুল ইসতিগফার :

আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবুউ লাকা বিজামবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। সহিহুল বুখারি : ৬৩০৬, সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৯৩

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না

ইবাদাত আল্লাহ তায়ালার জন্যে নাকি করোনা'র জন্যে?

আবু মুহাম্মাদ

আমরা সবাই জানি, করোনা গোত্রীয় এক ভাইরাস কিছু দেশে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়েছে বাকি আরো অনেক দেশে ছড়ানোর আশংকায় রয়েছে। এই মুহূর্তে সবার উপর করণীয় কি হবে তা নিয়ে আমাদের দেশে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কেহ অতি সতর্ক হয়ে কয়েক মাসের খাবার কিনে ঘরে বন্দি হয়ে যাচ্ছেন আবার অনেকে রয়েছেন অতি বেখেয়ালে। অনেকে ভাবছেন করোনা সংক্রমণ অসম্ভব আবার অনেকে ভাবছেন করোনা থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নেই। এই ব্যাপারে শরিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আলোচনা করা হয় তা সংক্রমণ নিয়ে প্রসিদ্ধ একটি হাদীস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ (لا عدوي و لا طيرة)।

এই হাদিসের শুরুতে لا শব্দটি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রচলিত অর্থে এটাকে "নফী জিনস" এর জন্যে ধরে অর্থ করা হয়; (সংক্রমণ রোগ ও কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই।) কিন্তু হাদীসের পরের অংশের দিকে খেয়াল করলে পূর্ণভাবে সংক্রমণকে অস্বীকার করা হয়েছে বুঝা যায় না। কারণ এই হাদীসের এক বর্ণনায় রয়েছে, (এক সাহাবী জিজ্ঞাস করলেনঃ অসুস্থ উট যখন সুস্থ উটের কাছে যায় তখন সব অসুস্থ হয়ে পরে কেন? তখন রাসূল আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করল কে?) উত্তরের মধ্যে সরাসরি সংক্রমণকে অস্বীকার করে বলা হয় নি, প্রত্যেকটা উটকেই আল্লাহ তায়ালা সরাসরি অসুস্থ করেন। বরং বলা হচ্ছে, কোন ভাইরাস নিজে থেকেই সংক্রমণ শুরু করতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে অনুমতি দিয়ে প্রথম উটে রোগাক্রান্ত করেন তখন সেটা সংক্রমিত হতে থাকে।

হাদীসের শেষে অন্য উটগুলোকে অসুস্থ উট থেকে দূরে রাখার আদেশ থেকেও এমনটাই স্পষ্ট হয়।

এই হাদীসের আরেক বর্ণনার শেষ রয়েছেঃ (কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে বাঘ থেকে দূরে থাক) যদি সংক্রমণ বলতে কিছু নাই থাকত তাহলে দূরে রাখতে ও থাকতে বলা হত না। যার ফলে বর্তমানের সব আলেমরাই এই হাদীসের অর্থ করছেনঃ (আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সংক্রমণ বলতে কিছু নাই) অর্থাৎ অন্য সকল রোগের মত সংক্রমণ রোগটাও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই ছড়াতে থাকে।

অনেক মুফাসসির لا শব্দটাকে 'নাহী'র জন্যে ধরে অর্থ করেছেনঃ (কেহ যাতে অন্যকে সংক্রমণ না করে) যেমনটা হজ্জের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না, অশোভন কাজ করবে না ও ঝগড়া করবে না হজ্জের মধ্যে) আর এই অর্থের ক্ষেত্রে পূর্বের মত তা'বীল করে সংক্রমণকে স্বীকার করার দরকার নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের অন্যান্য হাদীসেও মহামারী নিয়ে যে সমস্ত আদেশ এসেছে, তা থেকেও সংক্রমণকে ইসলাম স্বীকার করে নেয়া বুঝা যায়। যেমনঃ (অসুস্থ ব্যক্তি যেন সুস্থ ব্যক্তির কাছে না যায়)। সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করতে আসে তখন তাদের মাঝে একজন ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল। তখন উনার থেকে সরাসরি বায়আত না নিয়ে দূর থেকে বায়আত গ্রহণের কথা বলে সংবাদ পাঠান। ইসলাম বাহ্যিক সংক্রমণের পাশাপাশি মানসিক ও আভ্যন্তরীণ সংক্রমণকেও স্বীকার করে। হাদীসে এসেছেঃ (সালেহ ব্যক্তির সংসর্গ হল মেশক বিক্রেতার মত, তাঁর থেকে কিছু না পেলেও সুঘ্রান পাবে। এবং খারাপ ব্যক্তির সংসর্গ হল কামারের মত, যদি কালি না লাগে অন্তত ধোয়া লাগবেই) এই জন্যে তাওহীদের ক্ষেত্রে তাগুত্বের সংসর্গ ত্যাগ করাকে ঈমানের অংশ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আর সঠিক ইলম ও ফিক্বহের জন্যে জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা ব্যক্তিদের সংসর্গ অপছন্দ করাকে আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। এই সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে আমাদের করনীয় কি হবে তা নিয়ে অনেক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, যা আসবাব হিসেবে মান্য করা আবশ্যক। কারণ আমাদের শরীরের মালিক আমরা নই যে, যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারব, তাই সতর্কতার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সম্পদকে রক্ষা করা সবার উপর আবশ্যক। আর যদি অবহেলায় আমাদের মাধ্যমে অন্য কাহারো সংক্রমণ হয়, তাহলে আখেরাতে এর দায়ভার কোনভাবে এড়ানো যাবে বলে মনে হয় না। করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে করনীয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় উদাহারণ হতে পারে উমর রাজিঃ এর সময়ের মহামারী থেকে সুস্থতার সিদ্ধান্তগুলো।

উমর রাজিঃ এর সময়ে শামের আমওয়াস নামক স্থানে ব্যাপক ভাবে মহামারী ছড়িয়ে গেলে তা কোনভাবে ঠেকানো যাচ্ছিল না। ২৫ হাজার ও কোন বর্ণনামতে ৬০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। শুধু খালেদ রাজিঃর ৪০ জন সন্তান মারা গিয়েছিল, আবু উবাইদাহ ও মুয়াজ বিন জাবাল রাজিঃ সহ ১০ হাজার সাহাবী মারা গিয়েছিলেন। কোনভাবেই ডাক্তাররা এর কোন সমাধান বের করতে পারছিলেন না। শেষে উমর রাজিঃ তখনকার সময়ে পূরা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান আমর বিন আ'স রাজিঃকে ডাক্তার না হওয়া স্বত্বেও এই ভাইরাসের সমাধান বের করতে চিঠি লিখেন। তখন আমর রাজিঃ এমন সমাধান বের করেন যার ফলে তিন দিনেই মহামারী বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেনঃ আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম মহামারী ছড়ায় ১/ মানুষের জনসমাগমে ২/ ঘর-বাড়িতে। পাহাড় ও মরুভূমিতে রোগ ছড়ায় না। তাই তিনি আদেশ দিলেন; সবাই যাতে শহর ছেড়ে পাহাড় ও মরুভূমিতে ছড়িয়ে পরে এবং কোন ২ ব্যক্তি যাতে একসাথে না থাকে। যার ফলে তিন দিনেই মহামারী শেষ হয়ে যায়। আমরা যদি বর্তমান করোনা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উনার সিদ্ধান্তকে যাচাই করি তাহলে দেখব, উনার সমাধান এতটাই পারফেক্ট ছিল যা আজ পর্যন্ত কেহ এর থেকে ভাল সমাধান দিতে পারে নি। প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের থেকে আলাদা হওয়ার বিষয়টা তো সবাই বুঝি, আর ঘরের আসবাব-পত্রে ভাইরাস যত দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারে, পাহাড়ে-মরুভূমিতে ধূলার উপরে তেমনটা সম্ভব নয়। আর এত বিশাল এলাকায় একজনের ভাইরাসের উপরে আরেকজনের হাতের স্পর্শের সম্ভাবনাও তেমন নেই। আর এই অভূতপূর্ব কাজের ফলে তখনকার সময়ে ভাইরাস সনাক্ত করে আলাদা করা বা কীটনাশক স্প্রে করা ছাড়াই সব সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে আমাদেরকেও শিক্ষা গ্রহণ করে যতটা সম্ভব খুলা স্থানে থাকা ও প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ করোনা ভাইরাস আলামত প্রকাশ করা ছাড়াই অনেক দিন টিকে থাকতে পারে। তাঁর মানে শুধু অসুস্থ মানুষ থেকে দূরে থাকলেই চলবে না, সুস্থ মানুষরাও ১৪ দিন আলাদা থাকতে হবে যদি ব্যাপক ভাবে সমাজে ছড়িয়ে পরে। সেই সাথে বিশেষ ভাবে চেহারাকে হাত-কাপড় সহ যেকোন জিনিসের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সালাফরা বলেছেনঃ মহামারী ঈমানের জন্যে ফিতনা হিসেবে অবতীর্ণ হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজেও করোনা ভাইরাসের ফলে মৌলিক কয়েক ধরনের আকীদাগত সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উমর রাজিঃ এর সময়ে শামের আমওয়াস নামক স্থানে ব্যাপক ভাবে মহামারী ছড়িয়ে গেলে তা কোনভাবে ঠেকানো যাচ্ছিল না। ২৫ হাজার ও কোন বর্ণনামতে ৬০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। শুধু খালেদ রাজিঃর ৪০ জন সন্তান মারা গিয়েছিল, আবু উবাইদাহ ও মুয়াজ বিন জাবাল রাজিঃ সহ ১০ হাজার সাহাবী মারা গিয়েছিলেন। কোনভাবেই ডাক্তাররা এর কোন সমাধান বের করতে পারছিলেন না। শেষে উমর রাজিঃ তখনকার সময়ে পূরা আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান আমর বিন আ'স রাজিঃকে ডাক্তার না হওয়া স্বত্বেও এই ভাইরাসের সমাধান বের করতে চিঠি লিখেন। তখন আমর রাজিঃ এমন সমাধান বের করেন যার ফলে তিন দিনেই মহামারী বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথমত এই সমস্ত সতর্কতার কথা বললেই অনেকে বলেন, আপনার মধ্যে কোন তাওয়াক্কুল নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুয়া কথা, আসবাব গ্রহণ ছাড়া তো তাওয়াক্কুলই হবে না। আমরা যত বেশি আসবাব গ্রহণ করব তত বেশি তাওয়াক্কুল হবে।

কারণ তাওয়াক্কুল হচ্ছেঃ (আসবাব গ্রহণের পর আসবাবের উপর থেকে ভরসা উঠিয়ে পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার উপরে ভরসা করা) যে যত বেশি আসবাব গ্রহণ করবে তাঁর আল্লাহ তায়ালার উপরে মানসিক ভাবে ভরসা করতে তত কষ্ট হবে, আর এই দৃশ্যমান বিষয়ের উপর থেকে বিশ্বাস উঠিয়ে অদৃশ্যের উপরে বিশ্বাসের নামই তাওয়াক্কুল।

আবার অনেকে মাস্ক লাগিয়ে, হাইড্রোক্লোরুকুইন ঔষধ আর কয়েক বস্তা চাল কিনে ভাবতে থাকে, ভাইরাস আমাকে কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তারা এখানে আসবাবের উপরেই পূর্ণ ভরসা করে ফেলছেন, যা ঈমানের জন্যে ক্ষতিকর। বরং এই বিশ্বাস রাখতে হবে, আমরা যতই মানুষ থেকে দূরে থাকি বা মাস্ক ব্যবহার করি আর সাবান ব্যবহার করি, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলে কোন কিছুই আমাকে রোগ থেকে বাঁচাতে পারবে না। হাদীসে শেষ অংশে; (প্রথমটাকে কে আক্রান্ত করল?) এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এই বিষয়টা বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে সব আসবাব গ্রহণ করেও পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে হবে।

অনেকে বলছেন, মুসলিম কোনভাবেই আক্রান্ত হবে না, ওজু-নামাজ তাঁকে বাচিয়ে রাখবে। যদি এমন হয় তাহলে সাহাবীরা কেন মারা গিয়েছেন তাঁর উত্তর তাদের কাছে নেই। অনেকে এমনটাও বলে ফেলছেন; যদি আমরা আক্রান্ত হই তাহলে কুরআন-হাদীস মিথ্যা হয়ে যাবে বা আক্রান্ত ব্যক্তি কাফের ও মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সমস্ত জাহালত থেকে রক্ষা করুন। সালাত ও সবর আল্লাহ কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম, এগুলো আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তাই ওজু, দোয়া, সালাত ও আজকার আদায়কে শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

অনেকে বলছেন, মুসলিম কোনভাবেই আক্রান্ত হবে না, ওজু-নামাজ তাঁকে বাচিয়ে রাখবে। যদি এমন হয় তাহলে সাহাবীরা কেন মারা গিয়েছেন তাঁর উত্তর তাদের কাছে নেই। অনেকে এমনটাও বলে ফেলছেন; যদি আমরা আক্রান্ত হই তাহলে কুরআন-হাদীস মিথ্যা হয়ে যাবে বা আক্রান্ত ব্যক্তি কাফের ও মুনাফিক হিসেবে গণ্য হবে।

আবার অনেকে এতটাই হতাশ যে, ভাবছেন বাঁচার কোন আশাই নেই। তাই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছেন। আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে এমনভাবে হতাশ হয়ে যাওয়াও কুফুরীর দিকে ধাবিত করে। কারণ এখানে ভাইরাসকে সর্বোচ্চ শক্তিশালী ভাবা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার রহমতের ব্যাপারে নিরাশা তৈরি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে উত্তম ধারনা করা হচ্ছে না বরং ভুল ধারনা করা হচ্ছে।

মহামারীতে মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভের কথা এসেছে হাদীসে। আল্লাহর পথে শাহাদাতের মর্যাদা অনেক, কিন্তু সেই সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণের চেয়ে আল্লাহর পথে বেঁচে থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মেহনত করে যাওয়ার ফজিলত অনেক বেশি। আবু বকর রাজিঃ শহীদ ছিলেন না, তারপরেও তিনি কিন্তু উম্মতের সবার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান। কুরআনেই তো সিদ্দীকদের মর্যাদা শহীদদের থেকে বেশি বলা হয়েছে। তাই হতাশ হয়ে শাহাদাতের মৃত্যু কামনার চেয়ে ঈমানের সাথে সিদ্দীকের মত বেঁচে থাকার তাওফীক কামনা করতে হবে।

করোনা ভাইরাসের লক্ষণ হচ্ছে, প্রথম ১/২ দিন জ্বর হয় ও সাথে মাথা ব্যথা ও সর্দি হতে পারে। ৩, ৪ দিনের গলা ব্যথা হয় ও তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ৪-৫ দিনে শুকনো কাশি ও ভারী কফ-সর্দি হয়, ডায়রিয়াও হতে পারে। তবে ৮০% রোগীর ক্ষেত্রে ৭-৮ দিনের ভিতরেই গলা ব্যথা কমে ভাইরাস মুক্ত হয়ে যায়। আর যদি এন্টিবডি ভাইরাসকে শেষ করতে না পারে তখন তা ফুসফুসে চলে যায় ও পূরা বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিতে থাকে। ফলে শরীর ব্যথা হয়ে দুর্বল হয়ে যেতে থাকে এবং কিডনী বা অন্য কোন অঙ্গ আগে থেকে অসুস্থ থাকলে তা ড্যামেজ হয়ে যায় ও মারা যায়। এই সময়ে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়ে তা বাড়তে থাকে, জ্বর ১০৪-১০৫ উঠানামা করতে থাকে। লাইফ সাপোর্ট ও আইসিউ দরকার হয়।

অনেক ডাক্তার বলেছেন, যে ২০% সিরিয়াস পর্যায়ে চলে যায় তাদের মধ্যে ৭০-৮০% এর পিছনে দায়ী তাদের মানসিক আতংক। কারণ কেহ যখন করোনা ভাইরাস হয়েছে শুনে আতংকিত হয়ে যায় তখন তাঁর অন্টিবডি দুর্বল হয়ে পরে, শরীরের কোষগুলো শিথিল হয়ে ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পরে। অন্যদিকে কেহ যদি মানসিক ভাবে সতর্ক হয় তখন তাঁর অন্টিবডি যে কোন রোগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হয়ে উঠে আল্লাহর ইচ্ছায়। তাই আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে, এখন আমাদেরকে মানসিকভাবে ঈমান, ইখলাস ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি ও বাহ্যিকভাবে

ইবাদাতে সর্বোচ্চ মনযোগী হতে হবে। যা ইদানিং অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে মাশাআল্লাহ। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, আমরা ইবাদাতগুলো কি উদ্দেশ্যে করব? কিছু মানুষ আছে যারা ব্যাপকভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোন নিয়ামতকে ছিনিয়ে নেন। যখনই কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন তখন সেই নিয়ামত ফিরিয়ে আনার জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে থাকেন। পরে যখন ফিরিয়ে দেয়া হয় তখন আবার সে গোনাহের জীবনে ফিরে যায়। এদেরকে আল্লাহ তায়ালা 'মুসরিফ' বলে সম্বোধন করেছেন। কুরআনে এসেছেঃ (যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। সূরা ইউনুস-১২)।

আমাদেরকে এমন হওয়া চলবে না। এই সমস্ত ব্যক্তিদের আরেকটা অবস্থা হচ্ছে, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ইবাদাত করার পরেও যখন দেখে আল্লাহ তায়ালা তাদের নিয়ামতকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, তখন তারা আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে হতাশ হয়ে ইবাদাত করা ছেড়ে দেয়া এবং বিভিন্ন ধরনের কুধারনা করতে থাকে। অনেকে বলেঃ আল্লাহ কেন শুধু আমাকেই বিপদ দেন? আমাদেরকে কেন এখনো বিপদ মুক্তি দিচ্ছেন না? অবস্থা কেমন যেন এটা বুঝায়, আমি তো আমার দায়িত্ব আদায় করেছি কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উনার দায়িত্ব আদায় করছেন না। মা'আযাল্লাহ। এদেরকে আরবীতে বলা হয় 'হাবশাত্বী' আল্লাহ তায়ালার প্রতি যাদের ভালবাসা শর্তযুক্ত। তাই আমাদের ইবাদাত হবে শুধুই আল্লাহর জন্যে। করোনা থেকে বাঁচলেও ইবাদাত হবে, আল্লাহ না করুন, করোনা আক্রমণ করলেও ইবাদাত করেই যাব ইনশাআল্লাহ।

একবার মহামারীতে ইবনে হাজার রাহিঃর মেয়ে মারা যান। সেই কষ্টে উনি মহামারী নিয়ে সারে চারশো পৃষ্ঠার এক কিতাব লিখে ফেলেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ (অনেক মহামারী শীতকালে হয় আবার অনেকগুলো গ্রীষ্মকালে। তবে মুসলিমদের ইতিহাসে অধিকাংশ মহামারী বসন্ত কালে হয়ে গ্রীষ্মকাল শুরু হলেই শেষ হয়ে যায়।) যদি আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা এমনটাই হয় তাহলে আশা করা যায় গ্রীষ্মকালে করোনা ভাইরাস থাকবে না, বাকি সবকিছু আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আল্লাহ তায়ালা করোনা ভাইরাসকে কাফেরদের জন্যে আযাব ও মুসলিমদের রহমত ও দ্বীন-ঈমানের পথে এগিয়ে আসার মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন, আমীন। মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

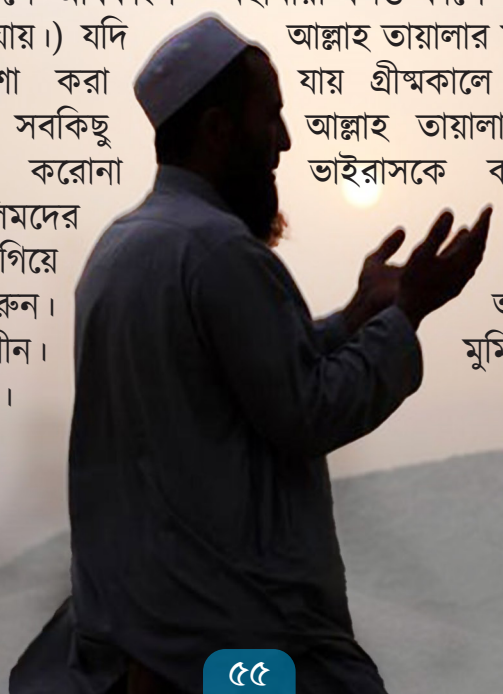

মুজাহিদীনদের ব্যাপারে এলাকায় শত্রু কমানোর অভিজ্ঞতা

Ahmed Faruq

আজকে সম্মানিত ভাইদের কিছু জানা কথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, আর তা হলো: এলাকার শত্রু কমানোর কিছু কৌশল। যা অনেকেই আমার থেকে ভাল জানেন এবং ভাইয়েরাও অনেক বলেছেন। বিষয়টা আরো আগে লেখা উচিৎ ছিল তার পরও আজ, আমাদের অনেক ভাই আছেন যাদের আচরণ, কথা বলার সময় সুন্নাহ অনুসরণ, চলা-ফেরার পরিচ্ছন্নতা, আখলাক, চরিত্র দেখেই মানুষ অনেকে বুঝে ফেলে যে এত উত্তম মানুষ জঙ্গি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না,, কিন্তু আমাদের অনেক ভাইয়েরা এই ব্যাপারে গাফেল তাদের জন্যই আজ এই আয়োজন,

১. অহংকার থেকে সম্পুর্ণ বেঁচে থাকাঃ
নিজেকে অহংকার মুক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আমরা এক খ্রিস্টান মিশনারির লোকের সাথে বাহাস করছিলাম এক পর্যায়ে সেই মুরতাদ এর কাছে শুনলাম তার হাতে নাকি আট হাজার মানুষ খ্রিস্টান হয়েছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সে বস্তিতে যায়, ফুটপাতে যায়, গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে খৃষ্টান বানায় টাকা পয়সা দিয়ে,, ভাইজান চিন্তা করুন! তারা জাহান্নামে লোক বাড়ানোর জন্য মানুষকে বুকে জড়িয়ে নেয় আর আমরা মানুষকে জান্নাতের দিকে ডাকবো, কিন্তু কাউকে বুকে টেনে নিতে পারি না, আর মনে করি আমার কাপড় ময়লা হয়ে যাবে বুঝি। তাই প্রথম হলো: অহংকার থেকে বেঁচে থেকে সবাইকে বুকে টেনে নেওয়া। ছোট, বড়, বাচ্চা, বৃদ্ধ সবাইকে। তবে হ্যাঁ, যারা পছন্দ করে না তাদের সাথে শুধু মুসাফাহ।

২. সালামঃ যার মধ্যে সামান্য মুসলমানের পরিচয়টুকু পাওয়া যায় যেমন জুমার নামাজ পড়ে, কিংবা চরিত্র ভাল এমন মানুষকেও সালাম দেওয়া এবং কেউ সালাম দিলে স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে উত্তর দেওয়া। এক কথায় শ্রদ্ধেয় শায়েখ "তামিম আল আদনানী (হাফি)"এর ভাষায় "প্রাণ খুলে ভালবাসুন"।

৩. নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করা।
সম্মানিত ভাই, জেনে রাখুন আপনার এলাকার তানজিম আপনি অর্থাৎ মানুষ দেখবে না যে "আল কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশ" এর আচরণবিধিতে কি লেখা আছে বরং মানুষ শুধু দেখবে যে আপনি কেমন আপনি ভাল হলে মানুষ বলবে যে ওরা ভাল, না হলে আপনার ভুলের কারণে মানুষ মুজাহিদগণকে খারাপ বলবে। যেমন ধরুন- আপনার এলাকার কেউ বলতে পারবে না যে, এই ছেলে আমার মেয়ের দিকে বা আমার বোনের দিকে তাকিয়েছে। কেউ বলতে পারবে না যে, এই ছেলেকে আমি দেখেছি যে, অমুক ব্যক্তির সাথে খারাপ আচরণ করছে। এক কথায় মানুষের চোখে যেগুলো খারাপ আল্লাহর জন্য সেগুলো ত্যাগ করা।

৪. ছোটদেরকে অবহেলা না করা। কারণ এদেরকে ভালবাসলে এদের পিতা-মাতা আপনার ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যাবে, আর প্রয়োজনে অল্প কিছু খরচ করা এদের জন্য।

৫. সমাজ সেবা করা। যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকেন চেষ্টা করবেন একটু সমাজ সেবা করতে, এতে এলাকার মানুষ আপনার ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, ঝড় হয়ে গাছ কিংবা বাশ রাস্তায় পড়ে আছে, মানুষের চলা ফেরায় সমস্যা হচ্ছে, আপনি কয়েকজন সক্রিয় ভাইকে সাথে নিয়ে সেটা সরানোর ব্যবস্থা করলেন। দেখবেন এমন ছোট খাটো কাজের জন্য এলাকার মানুষ আপনাকে অনেকদিন যাবত ভালবাসার পাত্র বানিয়ে রেখেছে। তবে কাজগুলো সবই হবে আল্লাহর জন্য।

৬. ঝগড়া উপেক্ষা করা। সম্মানিত ভাই খুব সাবধান,,,! কোন মতেই ফুরুঙ্গ এখতিলাফে জড়ানো যাবে না। প্রতিবেশির সাথে ঝগড়ায় জড়ানো যাবে না, মানুষকে শুধু ভুল বলা যাবে না, যদিও তারা ভুল করে। কিন্তু আস্তে আস্তে এগুতে হবে এক সময় দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি যা বলবেন এলাকার মানুষ তাই দলিল মনে করে মেনে নিবে। তবে কোন বিধান বা মাসয়ালা বলতে গেলে যোগ্যতা থাকতে হবে এবং আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

৭. মুচকি হাসিকে সহজ করে নেওয়া।
সালামের সময় কিংবা কথা বলার সময় সুন্নাহকে অনুসরণ করে কথা বলা এবং মুচকি হাসিকে নিজের জন্য সহজ করে নেওয়া দরকার।

৮. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া। এলাকার কোন পরিচিত লোক অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া, প্রিয় ভাই এটা এমন কাজ যা করলে সেই ব্যক্তি আর কোন দিন আপনার শত্রু হবে না ইনশাআল্লাহ।

৯. অপবাদের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকা। সবসময় অপবাদ দিতে পারবে এমন সকল পথ আটকিয়ে রাখা। যেমন ধরুন- এমন কোন ব্যক্তির সাথে খুব বেশি না মেশা; যার কোন মেয়ে বা বোন আছে, যে আপনার থেকে বয়সে ছোট।

১০. মসজিদ হাতে রাখা। অর্থাৎ মসজিদের সভাপতি, সেক্রেটারি, ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম এদের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখা দরকার। এটা আপনার কাজের ব্যাপারে অনেক সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

১১. মাঝে মাঝে ভোজনের আয়োজন করা। মাঝে মাঝে বনভোজন বা পিকনিক এর আয়োজন করা, এখানে উপস্থিত থাকবে আপনার টার্গেটকৃত মাদ'উ, উপস্থিত থাকবে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলে যদি তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে। এমন যদি হয় যে সে নিশ্চিত আপনার শত্রু কিংবা ইসলামের শত্রু, তাহলে সে দাওয়াত পাবে না।

Note: পিকনিকে খরচের চেয়ে আনন্দটা বেশি প্রাধান্য পাবে,, যেমন ধরুন কোন মাঠে আপনারা পিকনিক করলেন সেখানে থাকবে সম্মিলিত কণ্ঠে ইসলামী সংগীত,, থাকবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, থাকবে উন্মুক্ত প্রতিভা বিকাশ। সেখানে সবাই তার প্রতিভা প্রকাশ করবে; কেউ কবিতা কেউ গল্প বা কেউ হাসির বাক্স বলবে ইত্যাদি। খাবার শুরু করার আগে খাবারের সকল আদবগুলো বলে খাবার শুরু করলেন এবং সর্বশেষ পারলে দু'আ-মুনাজাত কিংবা সম্মিলিত ইসলামী সংগীত পরিবেশন করে শেষ করলেন।

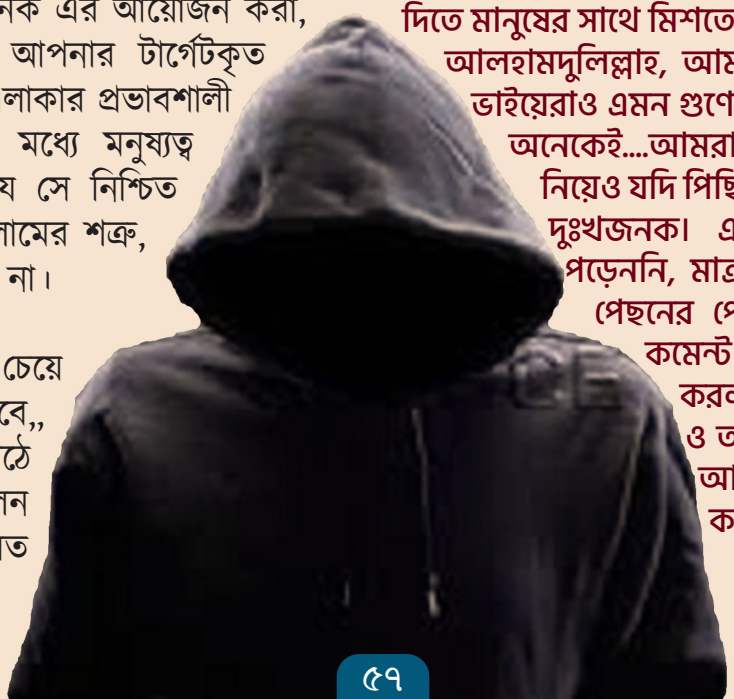

১২. দু'আ করা। খুব বেশি আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের কাজ সফল হওয়ার জন্য দু'আ করা।

১৩. সফলতা আল্লাহর দিকে নিসবত করা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে যোগ্যতা দান করেছেন এবং আপনার হাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যতটুকু খেদমত নিবেন, তার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া।
যে কথাগুলো বলা হলো; এর মধ্যে যা ভাল কথা হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তা'আলা যেন তা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করেন। আর যা ভুল হয়েছে, তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তা'আলা যেন তা আমাদের অন্তর থেকে ভুলিয়ে দেন, আমিন।

কমেন্ট

Ubada Ibnus Samit

মুহতারাম ভাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমাদেরকে উক্ত বিষয়ের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আসলে আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সামনে যেতে হবে, সুতরাং জনসংযোগ এবং জনসমসর্থন আমাদের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু জায়গায় প্রবন্ধে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমন স্বপ্রতিভ তাবলীগী ভাই পাওয়া যায়, তারা দাওয়াহ দিতে মানুষের সাথে মিশতে সংকোচ বোধ করেন না। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের শায়খ এবং অনেক ভাইয়েরাও এমন গুণের অধিকারী। কিন্তু আমরা অনেকেই....আমরা তাওহিদের সম্পদ বুকে নিয়েও যদি পিছিয়ে থাকি, তবে তা নিতান্তই দুঃখজনক। এই পোস্টটা অনেক ভাই পড়েননি, মাত্র ৩২ টা ভিউ হওয়ার পর পেছনের পেইজে চলে গেছে। এজন্য কমেন্ট করে সামনে আনার চেষ্টা করলাম, সকল ভাইয়ের পড়া ও আমল করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।আমীন

একটি উৎসাহমূলক কবিতা সাবিলুনা 'আল-জিহাদ'

সারিমুল মাসলুল

সাবিলুনা সাবিলুনা, ' আল-জিহাদ আল-জিহাদ';
তরীকুনা তরীকুনা 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ।'
চেয়ে দেখ ওই সূর্য হাসে, খোরাসান ভূমিতে;
শোন শোন ওই জিহাদের ডাক, আফ্রিকা, মালীতে,
শাম ইরাক আফগান, গায় জিহাদের গান
আরাকান হিন্দেও শোন- জিহাদের আহবান,
নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠে বাজে 'আল জিহাদ, আল জিহাদ।'

সাবিলুনা সাবিলুনা, ' আল-জিহাদ আল-জিহাদ';
তরীকুনা তরীকুনা 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ।'

চেয়ে দেখ ওই মাজলুমানের মুষ্টিবদ্ধ হাত,
এবার বুঝি হবেই শেষ জুলুমের কালো রাত।
রেখে হাতে হাত পাশাপাশি কাঁধ বলছে সবে,
'আল-জিহাদ আল-জিহাদ'।
সাবিলুনা সাবিলুনা, ' আল-জিহাদ আল-জিহাদ';
তরীকুনা তরীকুনা 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ।'

ইরাক, শামের ধ্বংসস্তূপে, আরাকানের রক্তস্রোতে
দিল্লির ঐ ভাঙা মিনারে, দজলা ফুরাতের কূল-কিনারে
'আল-জিহাদের আওয়াজ উঠে,
সাবিলুনা সাবিলুনা, ' আল-জিহাদ আল-জিহাদ';
তরীকুনা তরীকুনা 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ।'

দেখ দেখ ওই যায় চলে যায় কাফেলা জিহাদের
প্রভাত রবি আলো ছুঁড়ে ডাকছে আমাদের,
ক্ষতস্থানে হাত রেখে মাজলুম বলছে, 'আল জিহাদ।
সাবিলুনা সাবিলুনা, 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ';
তরীকুনা তরীকুনা 'আল-জিহাদ আল-জিহাদ।'

ফতোয়া

সংক্রমণের ভয়ে হত্যার বিধান কী?

Muhammad Jainul Abedin

সংক্রমণের ভয়ে হত্যার বিধান কী ?

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখতে/শুনতে পাচ্ছি যে, করোনা সংক্রমণের ভয়ে চায়না, ইতালি ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে করোনা সংক্রমিত লোকজনকে গুলি করে হত্যা করছে। মৃত্যুর ইনজেকশন দিয়ে সংক্রমিত লোককে হত্যা করা হচ্ছে! এই প্রেক্ষিতে আপনাদের প্রতি আবেদন! এই কঠিন মুহূর্তে আমাদের মানহাজের মুজাহিদ ভাইগণের ও মুফতীয়ানে কেরামগণের নিকট এর সমাধান চাচ্ছি এবং সাধারণ মুসলিম জনগণকে সতর্ক করানোর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

কমেন্ট

আদনানমারুফ
Senior Member

এই হাদিসটি পড়ুন আর একটু চিন্তা করুন,

لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم

দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চেয়ে তুচ্ছ। -জামে' তিরমিযি, ১৩৯৫ সুনানে নাসায়ী ৩৯৮৭

সুতরাং যদি করোনার কারণে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের শহিদ হয়ে যেতে হয় তবুও তা থেকে বাচার জন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। আহ! শায়খ আতিয়্যাহ লিবী রহিমাহুল্লাহু কতই না উত্তম কথা বলেছেন, উপরোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করে তিনি বলেন,

"আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাক, আমাদের তানযীম ধ্বংস হয়ে যাক, কিন্তু আমাদের দ্বারা যেন অন্যায়ভাবে (শরীয়তের আওতার বাহিরে) কোন মুসলমানের রক্তপাত না হয়। "

আর মুমিনের কিসের এত ভয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কুষ্ঠরোগীকে নিজের সাথে বসিয়ে খাবার খাইয়েছেন। (জামে' তিরমিযি ১৮১৭) যদিও অন্যান্য হাদিসে রাসূল কুষ্ঠ রোগী থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, কিন্তু সম্ভবত এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, মুমিন এসব মহামারীতে খুব বেশি আতংকিত হবে না, বরং সে আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে, এই বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর আদেশ ছাড়া তার কোন রোগ হতে পারে না। আর যদি কোন রোগ হয় তবুও তো তা মুমিনের জন্য রহমত, শাহাদাত ও গুনাহের কাফফারা।

চুক্তি এবং কিছু কথা

ইলম ও জিহাদ

দরবারি আলেমরা ছাড়াও কোন কোন বড় ব্যক্তি থেকে এ ধরনের কথা শুনা গেছে যে, বর্তমানে কোনো দারুল হরব নেই। কারণ, জাতিসংঘের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মাঝে চুক্তি হয়ে গেছে। তাই ফিকাহ ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে যে দারুল হরবের কথা বলা হয়েছে সেটা এ জামানায় নেই। তবে হ্যাঁ, ইজরাইলকে দারুল হরব বললে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে ইজরাইলও পূর্ণ দারুল হরব না। তবে বললে বলা যেতে পারে বা কেউ কেউ বলেনও। এ মতের প্রবক্তারা প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক কাফের গোষ্ঠীর সাথে যেসকল চুক্তি করে এসেছে – শরীয়তের মুওয়াফিক হোক কি মুখালিফ- সব ধরনের চুক্তি সহীহ হয়েছে এবং প্রতিটি মুসলিমকে তা মেনে চলতে হবে। যদি চুক্তি সহীহ না-ই হতো তাহলে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকতো না আর সকল কাফের রাষ্ট্র দারুল হরব থেকেও বের হয়েও যেতো না। চুক্তি সহীহ হয়েছে বলেই এমনটা হয়েছে। অতএব, চুক্তি সহীহ হয়নি বলার কোনো সুযোগ তাদের নেই। কাফের গোষ্ঠীর সাথে কি কি চুক্তি হয়েছে? যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হলো,

০১. মুসলিমদেরকে তাদের রব প্রদত্ত ধর্ম ইসলামের বিপরীতে কুফরি ধর্মের নিয়মকানুন এবং কাফের মুরতাদ ও ধর্মনিরপেক্ষদের বানানো মনগড়া আইনকানুন দিয়ে শাসন করতে হবে।

০২. যেকোনো মূল্যে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের সকল আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে হবে। আন্দোলনকারীদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী, দেশদ্রোহী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে জঘন্য অপরাধী সাব্যস্ত করতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করতে হবে। হ্যাঁ, গৃহপালিত ও নামসর্বস্ব কিছু ইসলামী দল রাখতে অসুবিধে নেই, যারা নামে ইসলামিক, কাজে-কর্মে গণতান্ত্রিক।

০৩. সন্ত্রাস দমনের নামে কুফরি বিশ্ব ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখন ও যেখানে যুদ্ধে নামবে, দালাল শাসকগোষ্ঠী তাদের সমর্থন করবে এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করবে।

০৪. যত জায়গায় মুসলিমদের উপর নির্যাতন আসবে, সেগুলোকে উক্ত ভূখণ্ডগুলোর আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চালাতে হবে এবং দালাল শাসকগোষ্ঠী মুসলিমদের সহায়তার জন্য সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং অপরাপর মুসলমানদেরকেও করতে দেবে না।

০৫. কোনো মুসলিম দেশ কোনো কাফের দেশে জিহাদের নামে বা অন্য কোনো ইস্যু ধরে আক্রমণ চালাতে পারবে না বা কেউ আক্রমণ চালালে সহায়তা করতে পারবে না, বরং প্রতিরোধ করবে।

এগুলো মৌলিক কিছু পয়েন্ট। এগুলোর বাস্তবতা আমরা এক শতক ধরেই দেখে আসছি।

পরিণতিতে:

০১. মুসলিম বিশ্ব থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদ সম্পূর্ণ উৎখাত হয়েছে এবং জিহাদ সবচেয়ে বড় অপরাধে পরিণত হয়েছে, যার অপরাধীরা কোনোভাবেই মাফ পাওয়ার যোগ্য নয়।

০২. মুসলিমরা আজ রবের শরীয়তের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জন্তু জানোয়ারদের বানানো কুফরি আইনকানুনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

০৩. বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে মুসলিমরা নির্যাতিত। দালাল শাসকগোষ্ঠী সেগুলোকে আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে চুপ করে আছে। বরং সমর্থন করে যাচ্ছে এবং সর্বপ্রকার সহায়তা করে যাচ্ছে।

০৪. যারা নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে দাঁড়াতে চাচ্ছে বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন ও জিহাদে নামতে চাচ্ছে তারা জঘন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বের আগ্রাসনের একক টার্গেটে পরিণত হয়েছে।

মোটামুটি এগুলো চুক্তির মৌলিক ফলাফল। উপরোল্লিখিত চুক্তি এবং সেসব চুক্তির উপরোল্লিখিত ফলাফলের পরিণতিতে সকল কাফের রাষ্ট্র দারুল হরব থেকে বেরিয়ে গেছে। আজ যারা মুসলিমদের কর্ণধার বলে সমাজে পরিচিত তাদের বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সারকথা এটাই।

একটি আপত্তি :

হয়তো কেউ আপত্তি করবেন যে, তারা বলেছেন দারুল হরব হয়নি। কিন্তু তাই বলে যে সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম হয়ে গেছে তা তো জরুরী নয়। দারুল হরব না হলেও তো জিহাদ হতে পারে। যেমন বাগী ও খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়। তাদের এলাকা তো দারুল হরব হয়ে যায়নি।

জওয়াব :

কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করে লাভ নেই। আকল প্রসূত নতিজা অনেক বের করা যাবে; বাস্তবতা এর বিপরীত। যারা বলেছেন দারুল হরব রয়নি, তারা কখনও এ অর্থে বলেন না যে, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েজ। দারুল হরব থেকে বের করার মূল মাকসাদই তো জিহাদ হারাম করা। নয়তো দারুল হরব থেকে বের করার কি ফায়েদা আছে তাদের কাছে? তাদের কেউ কেউ তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম। বরং সেসব কাফের রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার আহ্বানও মুসলিমদের তারা জানিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ তো আরো এগিয়ে বলেছেন, আমেরিকার পক্ষ হয়ে আফগান তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমেরিকার মুসলমানদের জন্য জায়েজ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

পর্যালোচনা

কর্ণধারদের বক্তব্য ও বক্তব্যের ফলাফল আমরা দেখলাম। এবার শরীয়তের আলোকে আমরা একটু পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এক.

চুক্তি মুসলমানদের উপর বর্তানোর জন্য চুক্তিকারী ঈমানদার হতে হবে। আর বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বেঈমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু'মিনদের উপর কোন (কর্তৃত্বের) পথ রাখবেন না।" (নিসা ১৪১)

কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

ومنها: الإسلام، فلا يصح أمان الكافر. اهـ

"আমান (শান্তি চুক্তি) সহীহ হওয়ার আরেক শর্ত হল- আমানদাতা (চুক্তিকারী) মুসলমান হওয়া। কাজেই কাফেরের আমান (চুক্তি) সহীহ নয়।"
-বাদায়িউস সানায়ি': ১৫/৩০৪

তারা হয়তো এর জওয়াবে বলবেন, আমরা শাসকদের কাফের মনে করি না। উলূল আমর মনে করি। খলিফা-সুলতান মনে করি। তখন দ্বিতীয় পয়েন্ট আসবে:

দুই.

চুক্তিকারীরা মুসলমানদের প্রতিনিধি নয়। মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি বানায়নি। তারা নিজেরাই অস্ত্রবলে কাফেরদের সাথে আঁতাত করে মুসলমানদের উপর চেপে বসেছে এবং সুবিধা মতো চুক্তি করে এসেছে। চুক্তির বিষয়আশয় মুসলমানদের সামনে পেশ করলে নিশ্চিত যে, জনসাধারণ এ ধরনের চুক্তি মানতেন না। এর উত্তরে হয়তো সহজেই তারা বলবেন, অস্ত্রবলে চেপে বসলেও খলিফা হয়ে যায়। আর খলিফার চুক্তি জনসাধারণের জন্য পালনীয়। আমরা অবশ্য মেনে নিতে পারি না যে, চেপে বসলেই খলিফা হয়ে যায়। কেননা, খলিফা হওয়ার জন্য শরীয়ত কায়েম করা শর্ত। যেমনটা হাদিসে এসেছে,

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

"যদি তোমাদের উপর কোনো গোলামকেও আমীর বানানো হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহলে তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।"–সহীহ মুসলিম ৪৮৬৪

অতএব, যে আমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করবে না, কুফুর দিয়ে শাসন করবে সে আমাদের কেউ নয়। সে আমাদের, আমাদের ধর্মের এবং আমাদের রবের দুশমন। তাগুত। কথা প্রসঙ্গে যদি মেনেও নেই যে, তারা মুসলমানদের উলূল আমর তবুও আপত্তি কাটছে না।

তিন.

চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য চুক্তি শরীয়ত অনুযায়ী হতে হবে। শরীয়ত বিরোধী চুক্তি শত হাজারো বার করলেও সহীহ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোন শর্তই বাতিল; যদিও শত শর্ত হয়।"-সহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২১৬৮

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما،» والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» [رواه الترمذي (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح]

"মুসলমানদের পরস্পরে সন্ধি বৈধ। তবে এমন সন্ধি নয়, যা কোন হালালকে হারাম করে বা কোন হারামকে হালাল করে। মুসলমানগণ তাদের কৃত শর্ত মেনে চলবে। তবে এমন শর্ত নয় যা কোন হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে।"-সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১৩৫২; আলমু'জামুল কাবীর- তাবারানী, ১৭/২২

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

فإن أعطي الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه ما لا يصلح في الإسلام لقوله – صلى الله عليه وسلم – «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» –المبسوط 10\85

"যদি এসব (বাতিল শর্তে) সন্ধি ও যিম্মার চুক্তি করে তাহলে শরীয়তে সহীহ নয় এমন সকল শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর কিতাবে নেই এমন সকল শর্তই বাতিল'।"–মাবসূত ১০/৮৫

শাসকগোষ্ঠী যদি চুক্তি করে আসে যে, মুসলমানরা নামায পড়তে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না, তাদের মেয়েদেরকে যিনার বাজারে বিকিয়ে দিতে হবে: আশাকরি কর্ণধারগণও মানবেন না যে এগুলো সহীহ হবে এবং মুসলমানদের মেনে চলতে হবে। যেসব শর্তের ভিত্তিতে কর্ণধারগণ কাফের রাষ্ট্রগুলোকে দারুল হরব থেকে বের করতে চাচ্ছেন সেসব শর্তের প্রত্যেকটাই শরীয়ত বিরোধী। আজীবনের জন্য জিহাদ বন্ধ করে দেয়া ও জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা, শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে কুফরি আইন দিয়ে শাসন করা, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা দেয়া, মুসলমানদেরকে কাফেরদের জুলুমে ঠেলে দেয়া- এসব শর্ত যে শুধু শরীয়ত বিরোধী তাই নয়, বরং কুফর। এ ধরনের চুক্তি সহীহ বলার কোনো সুযোগ নেই। আর মুসলমানদের জন্য মেনে চলা আবশ্যক হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। আশাকরি কর্ণধারগণও এ ব্যাপারে দ্বিমত করবেন না।

চার.

এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, চুক্তি হতে হবে মুসলমানদের স্বার্থে। যে চুক্তি মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীত হবে তা মুসলমানদের উপর বর্তাবে না। মুসলমানরা তা মানতে বাধ্য নয়। মাওসিলি রহ. (৬৮৩হি.) বলেন,

والمعتبر في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين، فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها

"চুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো ইসলাম ও মুসলমানদের মাসলাহাত। মাসলাহাত থাকলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়।"–আলইখতিয়ার ৪/১২১

শাসকগোষ্ঠী যে কাফেরদের দালাল এবং তাদের সকল চুক্তি যে কাফেরদের স্বার্থে তা চক্ষুষ্মান কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই যে কেউ তা অনুধাবন করতে পারবে।

পাঁচ.

কাফেরদের সাথে কি কি চুক্তি কি কি শর্তে হতে হবে এগুলো শরীয়তে স্পষ্ট। সেসব শর্তে যদি সহীহ চুক্তিও করা হয়, তাহলেও যে দারুল হরব দারুল হরব থেকে বের হয়ে যায় এমন কোনো দলীল কুরআন হাদিসে নেই, আইম্মায়ে মুসলিমিনের কেউ এ কথা বলেছেন বলেও আমার জানা নেই। অধিকন্তু কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালাবে, তাদের ভূমি দখল করে নেবে, তাদের সম্পদ লুট করবে, তাদের ইজ্জত-আব্রু ও জান-মাল নষ্ট করবে, তাদের ধর্ম মানতে বাধা দেবে এবং কুফরি আইন মানতে বাধ্য করবে তখনও যে চুক্তি বহাল থাকবে এমনও তো কোনো কথা নেই। চুক্তি তো আর এমন কোন বস্তু নয় যে, একবার হয়ে গেলে কেয়ামত পর্যন্ত আর ভাঙবে না। চুক্তি হয়েই থাকে মুসলমানদের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু ও দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে। যখন এগুলোর উপর আগ্রাসন আসবে তখন তো আর চুক্তি বহাল থাকার কোনো অর্থ নেই।

ছয়.

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, শাসকগোষ্ঠী কখনও বলে না যে, তারা শরীয়ত মোতাবেক চুক্তি করেছে তাই জনগণকে তা মানতে হবে। তারা শরীয়তের ধার ধারে না। শরীয়ত তাদের কাছে অচল। তারা শরীয়তের অনুসারীও নয়, শরীয়তের কোনো জায়গা তাদের শাসনের নীতিমালায় নেইও। তারা রাষ্ট্র চালায় সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের কুফরি নীতির আলোকে। কিন্তু কর্ণধারগণ নিজেদের দায় অন্যের পিঠে চাপাতে বারবার বলে বেড়ায় এবং ঠেলেঠুলে প্রমাণ করতে চায় যে, এসব শাসক আমাদের উলূল আমর। আমরা এখন দায়িত্বমুক্ত। শাসকরা যা বলবে তাই আমাদের মাননীয়, পালনীয়। আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আসলে নিজেদের দায়সারা করতেই এ শোরগোল। কিংবা নিজেদের গদি ঠিক রাখতে। কিংবা পিঠ বাঁচাতে।

যারা চুক্তি করেছে তারা চুক্তির যোগ্য নয়, যেসব শর্তে চুক্তি হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী, বরং শরীয়তের কোনো ধারই ধারা হয়নি, চুক্তি সম্পূর্ণ কাফেরদের মাসলাহাত ও কল্যাণে আর মুসলিমদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র- তখন সে চুক্তি কিভাবে সহীহ হলো আর সেগুলোর আলোকে কিভাবেই বা সকল দারুল হরব মূহুর্তে তার অস্তিত্ব হারাল বুঝতে পারলাম না। কর্ণধারগণ অবশ্য তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনো দলীল দেন না। এ মোটামুটি হাকিকত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

কাশ্মীর নিয়ে সম্ভাব্য উদ্ভূত পরিস্থিতি ও রূপক ঘটনা!

Masum Shariar

গত পরশু: বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল ঘিরে রেখে হামলা চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা। ঐ এলাকাটিতে হিন্দুদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তারা প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে এলাকাটিতে।

গতকাল: মুসলিমদের এলাকাকে হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়না। তাই, প্রতিরোধ গড়ে তুলে এলাকাটিতে বসবাসরত স্বাধীনতাকামীরা। পাল্টা আঘাত হানে হিন্দুত্ববাদীদের দুর্গে। আর, এতে নিন্দার মুখে পড়তে হয় স্বাধীনতাকামীদের।

আজ: ঐ এলাকাতেই বাস করে হাসানের চাচা। হাসান বাস করে ঢাকা। আজ হিন্দুরা এসে হাসানের চাচার পরিবারে আঘাত হেনেছে এবং সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। তখন, হাসানকে সান্ত্বনা দিতে "তারা" এসে বলে- "আরে ভাই, তুমি কিছু বললে কাল আরো দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে তোমার পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে! So, Don't talk, চুপ করে দেখে যাও। ফেসবুকেও কিন্তু এ বিষয়ে পোস্ট দিয়ো না, তাও তোমার উপর বিপদ ডেকে আনবে!"

আগামীকাল: হিন্দুরা স্লোগান তুলছে, "আল্লাহর নাম নেওয়ার মত কাউকে আমরা রাখবো না, কোন মুসলিমকে আমরা ছাড়বো না"। অতঃপর, যেমন কথা তেমন কাজ! আঘাত হানলো আব্দুর রহমান সাহেবের (হাসানের বাবা) বাড়িতে। চাচার এলাকার পাশেই ছিল তার বাড়ি। কিন্তু, আগেই আলাদা হয়ে ঢাকা চলে যাওয়ায় এ যাত্রায় সরাসরি হামলা থেকে বেঁচে গেল হাসান। কিন্তু যেই বাবাকে বাঁচাতে যাবে, "তারা" এসে বলে- "আহ! কীভাবে আঘাতটাই না হানলো! খুব কষ্ট লাগছে! তোমার কিন্তু ঘরে বিবি-বাচ্চা আছে। এখন তুমি গেলে তোমার পরিবারকে নিঃশেষ করে দিবে। তার চেয়ে বরং, তুমি তাদের সাথে মিলে যে সকল ব্যক্তিরা (স্বাধীনতাকামীরা) তাদের (হিন্দুত্ববাদীদের) উপর হামলা চালিয়েছিল তাদের হামলার নিন্দা জানাও। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলো। হিকমাহ অবলম্বন করো ব্যাটা, হিকমাহ অবলম্বন করো! "

পরের দিন: শেষ রক্ষা হলো না! হাসানের পরিবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হিন্দুত্ববাদীরা। কেননা, তাদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহ নাম নেওয়ার মত কাউকেই তারা রাখবে না। হাসান যেহেতু সামাজিকতা রক্ষায় মুখে আল্লাহর নাম নিতো, তাই তাকেও হিন্দুত্ববাদীদের হামলার মুখে পড়তেই হলো। কিন্তু, হাসানের উপর হামলার সময় 'তাদেরকে'ও (যারা হাসানকে বুদ্ধি দিতো) হাসানের পাশে দেখা গিয়েছিল! কিন্তু, 'তাদের' পা ছিল হাসানের মাথায়! অর্থাৎ, মাটিতে ফেলে হাসানকে 'তারা'ই মেরেছে!

এরপরের দিন: রাস্তায় দেখা যাচ্ছে 'তাদেরকে' (যারা হাসানকে হিকমাহ শেখাতো)! কিন্তু, তাদের পেছনে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে হিন্দুত্ববাদীরা!! রাস্তায় ফেলে পেটাচ্ছে 'তাদের'! 'তাদের' মধ্যে আবার অনেককে দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশের বাতির খুঁটিতে ঝুলে রয়েছে! ঝুলেও রয়েছে আবার অনেককে ঝুলানোও হয়েছে!! হায়! এবার কী ঘটলো? 'তাদেরকে' কেন মারলো?! আল্লাহু আলাম!

বি.দ্র: [এটা কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিকটবর্তী ভবিষ্যতে উপমহাদেশে উদ্ভূত সম্ভাব্য পরিস্থিতি, যা এই লেখকের চিন্তা-চেতনার লৈখিক রূপকরূপ!

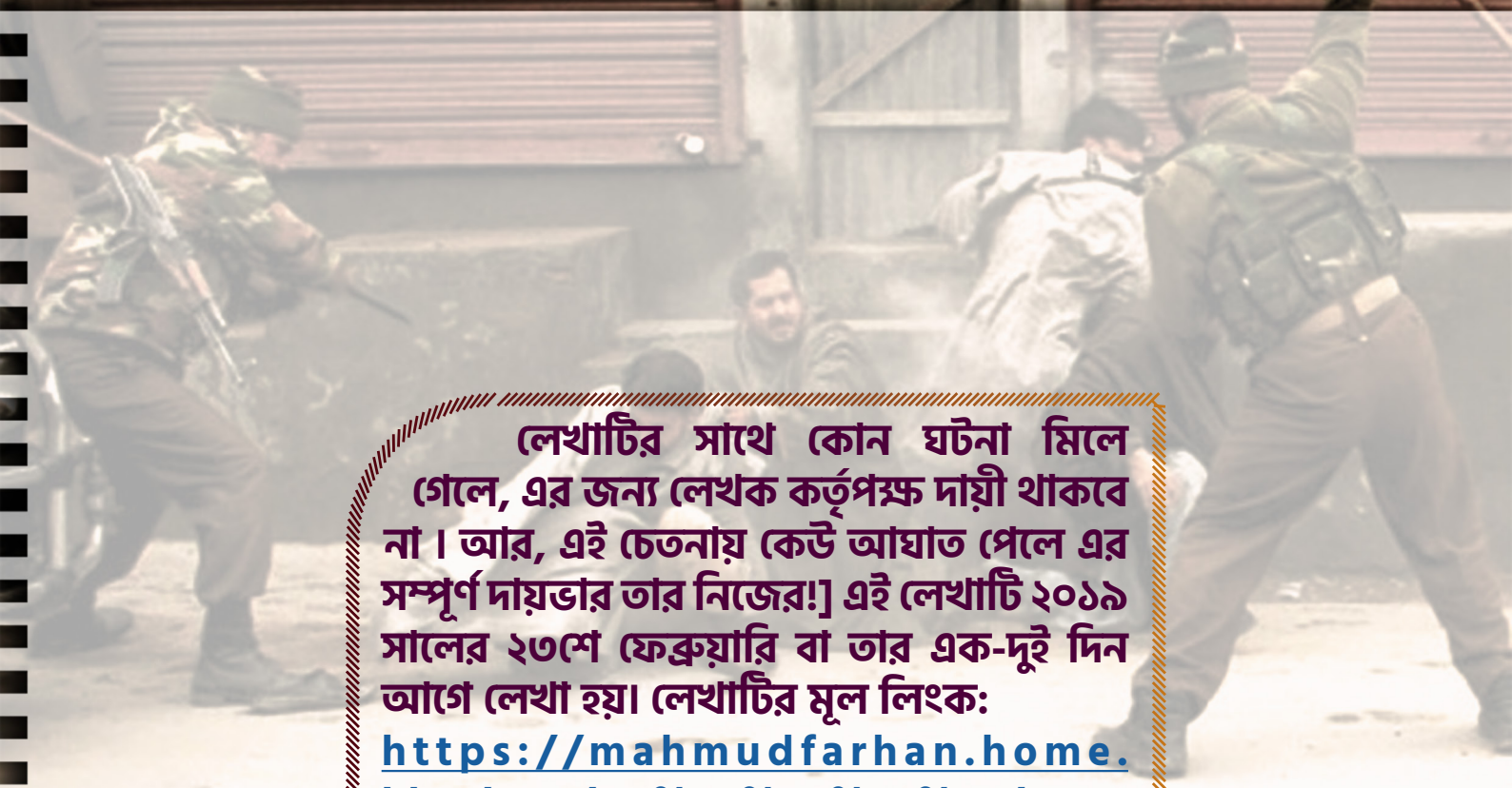

লেখাটির সাথে কোন ঘটনা মিলে গেলে, এর জন্য লেখক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। আর, এই চেতনায় কেউ আঘাত পেলে এর সম্পূর্ণ দায়ভার তার নিজের!] এই লেখাটি ২০১৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি বা তার এক-দুই দিন আগে লেখা হয়। লেখাটির মূল লিংক: https://mahmudfarhan.home.blog/2019/...6%89%e0%a6%a6/

লেখাটি এখন নতুন করে শেয়ার করার কারণ হলো, লেখকের আশংকা আমার মতে কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হয়েছে। লেখাটির ঠিক এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ভারতের মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দুরা। কাশ্মীরে যখন মুসলিমদের উপর হামলা চালানো হয়, তখন ভারতের মুসলিমরা কোনো ধরণের প্রতিবাদ করেনি। হয়তো, সরকার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ভয় করেছে। কিন্তু, শেষ রক্ষা তাদের হয়নি। আজ ভারতের মুসলিমদের উপরও মালাউনরা হামলে পড়েছে। কাল যে বাংলাদেশে আঘাত হানবে না, এর কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। বরং, এই মালাউনরা শীঘ্রই আঘাত হানতে পারে বাংলাদেশে। কিন্তু, মালাউনদের আঘাত প্রতিহত করার মতো প্রস্তুতি কি এই অঞ্চলের মুসলিমদের আছে?

কেন আমাদের উপর করোনা ভাইরাস আসলো? আসুন! কুরআন এবং হাদিস থেকে জেনে নেই

AL-ANSAR

সম্মানিত ভাইয়েরা!
আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি, আমরা যত ধরনের আযাব পতিত হয় সবগুলো আমাদের হাতের কামায়, নিজেদেরে কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ আমাদেরকে এসব শাস্তি দিয়ে থাকেন। হোক সেটা জলে বা স্থলে। যে আযাব আসে সবগুলো মানুষের হাতের কামায়। বর্তমানে যে করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত এক রোগ পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে তা কি আযাব? হ্যাঁ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব। চলুন আমরা জেনে নেই করোনা ভাইরাস কীভাবে আযাব হয়,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [٣٠:٤١]
স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

এই আযাব-গযব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ " . فَقِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
রাসূলুল্লাহﷺ বলেছেনঃ আমার উম্মাত যখন পনেরটি বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে তখন তাদের উপর বিপদ-মুসীবত এসে পড়বে। প্রশ্ন করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেগুলো কি কি?
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلاً وَالأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে, আমানতের মাল লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, জ্ঞান অর্জন করবে কিন্তু দ্বীনের জন্য না, পুরুষ স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে কিন্তু নিজ মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে, কিন্তু পিতাকে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে কলরব ও হট্টগোল করবে, পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য তাকে সম্মান দেখানো হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্য যন্ত্রের বিস্তার ঘটবে, মদপান করা হবে, এই উম্মাতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ শাস্তির এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুঁতিরমালা ছিঁড়ে গেলে একের পর এক তার পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে।
বি.দ্র: এখানে ২টি হাদিসের সমন্বয় করে দেওয়া হয়েছে। তিরমিজি: ২২১০, ২২১১

বনী ঈসরাইলকে আল্লাহ বর্তমান শাস্তির ন্যায় বিভিন্ন শাস্তি দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ [٧:١٣٣]

সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।

বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ যখন কোন শাস্তি (বিভিন্ন প্রকারের রোগসহ আরো যা রয়েছে) দেন, তখন মুশরিক, কাফের, ইহুদীরা এর প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কার করে গর্ব করে থাকে। তারা বলে, আমাদের ১ বছরের সময় দিলে আমরা করোনার জন্য ঔষধ আবিষ্কার করে দিব, আমরা ঔষধ আবিষ্কার করতেছি। নাউযুবিল্লাহ! যারা আল্লাহর আযাবকে নিয়ে এভাবে গর্ব করে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করতে চাই, আমরা তাদের থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ আমাদেরকে এমন গর্বকারীদের থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

আল্লাহর রাসূলﷺ ভিন্ন এ হাদিসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ . صلى الله عليه وسلم . ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ قَالَ : " أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ". قَالَ فَأَىُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ : " أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক আনসারী নবী (ﷺ) -এর নিকট এসে তাকে সালাম দিলো। অতঃপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তিনি বলেনঃ স্বভাব-চরিত্রে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক উত্তম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কে? তিনি বলেনঃ তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই সর্বাধিক বুদ্ধিমান।

আমরা যেন উত্তম ও বুদ্ধিমান মুমিন হতে পারি, আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন। *

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ . صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا . وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ".

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেনঃ হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভু-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযীলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।

এই ছোট সংক্ষিপ্ত ২টি হাদিস ও ২টি কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায়, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের নামে যে আযাব আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আমাদের নিজেদের জন্যই। আমরা যদি পাপাচার, অশ্লীলতা, বেহাপনা এবং আল্লাহর অবাধ্যতা না করতাম, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে এই ভাইরাস নামের আযাব আমাদেরকে দিতেন না। এখন এই আযাব দেওয়ার কারণ কি? ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ যে আযাব দেন না কেন, আল্লাহ চান আমরা যেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসি। আমরা যেন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে পারি, আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। বর্তমান আযাব থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

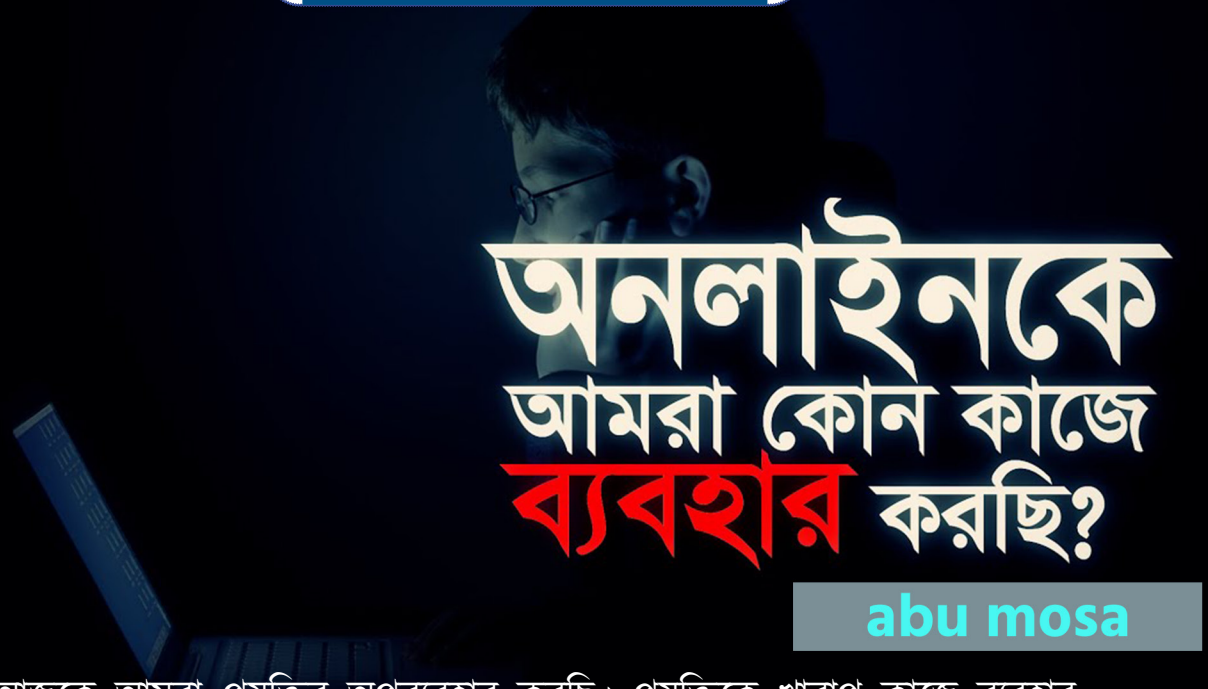

অনলাইনকে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি?

abu mosa

আজকে আমরা প্রযুক্তির অপব্যবহার করছি। প্রযুক্তিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করছি, আমাদের তরুণ সমাজ অনলাইনে সারাক্ষণ পাপাচার আর অশ্লীলতায় লিপ্ত। গান, মুভি ও পর্নোগ্রাফির মত অশ্লীল ভিডিওগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকাই মানে তাদের কাজ। হে যুবক! তুমি তোমার যৌবনের হেফাজত কর। হে যুবক! তুমি তোমার চোখের হিফাজত কর। তুমি একা একি কম্পিউটারের সামনে বসে বসে পাপাচার করছ, আর মনে মনে ভাবছ পৃথিবীর কেউতো তোমাকে দেখছেনা। মনে রেখ! তোমাকে পৃথিবীর কেউ দেখুক আর না দেখুক, আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা কিন্তু ঠিকই দেখছেন, পৃথিবীর কেউ তোমার পাপাচার সম্পর্কে জানুক আর না জানুক আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা ঠিকই জানেন।

তুমি কম্পিউটারের ব্রাউজিং হিস্টোরি থেকে তোমার পাপাচারকে যতবারই ডিলেট কর না কেন? মনে রেখ, আল্লাহর কাছে তোমার পাপাচারের হিস্টোরি কিন্তু ঠিকই থেকে যাচ্ছে। কিরমান-কাতিবিন তথা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগন তোমার অপরাধগুলোকে লিখে রেখেছেন, কিয়ামতের দিন সকলের সামনে তোমার অপরাধগুলো প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

আজকে তুমি যে হাত দিয়ে কির্বোড চাপছ, যে হাত দিয়ে মাউস নাড়ছ চোখ দিয়ে অশ্লীল জিনিসগুলো দেখছ, সেই হাত সেই চোখ সেদিন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তাআলা কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে বলেন আজকে আমি তোমাদের মুখগুলোকে বন্ধ করে দিব। আজকে তোমাদের অপরাধের ব্যাপারে তোমাদের হাত কথা বলবে, তোমাদের পা কথা বলবে। আজকে তোমাদের অপরাধের ব্যাপারে তোমাদের হাত, পা সাক্ষী দিবে।

সুতরাং হে যুবক! দুনিয়ার মানুষকে নয়। ঐ মহান সত্তাকে ভয় কর, ঐ মহান আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে কোন বিষয় গোপন থাকে না। যিনি তোমার অন্তরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, যিনি গায়েবের খবর রাখেন। সেই মহান প্রতিপালককে ভয় কর, সেই মহান রবকে ভয় করে সকল অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাক।

"হয়তো শরিয়াহ, নয়তো শাহাদাহ,,

অবুঝ ভাইদের দৃষ্টিতে দ্বীন-ই-ইলাহী কি সময়ের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ?

তুরস্কের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের ভালো দিকগুলোর আমি একজন নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী। কিন্তু আমি আমার অনেক বন্ধুকে তাঁর কুফরের বিষয়টা বলতে গিয়ে নিজেই সঙ্কোচ বোধ করি কেবল সেই ভাল দিকগুলোর কারণে। সমকালীন বাস্তবতায় যখন তাঁর কুফর নির্ভর রাজনৈতিক আদর্শের জাগতিক উপকারিতা, ফলপ্রসূ প্রভাব, কার্যকারিতা ও সুদূর পরিকল্পিত সাফল্যের একেকটি দিগন্ত তাঁর ভক্তকুল আবার সামনে তুলে ধরে, তখন এই সব কিছুর চাইতে তাওহীদে এলাহির সাময়িক অনুপযোগিতা (!), শত্রুর দিক থেকে আসা শক্ত প্রত্যাঘাত, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা—এগুলোই যে মূলত নববী পন্থার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল এবং যুগে যুগে নবীদের সঙ্গে সংঘটিত বাস্তবতা, সেকথা সাহস করে বলতে পারি না। জাগতিক সুযোগ-সুবিধা আর সাফল্যই যদি সত্যের দলিল হতো তাহলে আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহি তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি সঠিক সিদ্ধান্ত; আপাত পক্ষে যার কোন বিকল্প নেই। (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)

২০০১-এর হেকমত না বোঝা অপরিণামদর্শী (!) তালেবানদের ক্ষেত্রে যে কথা ঠিক সাড়ে ১৪ শত বছর আগে মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৌশলপূর্ণ বহুবিধ পন্থার পরিবর্তে খালেস তাওহীদের ডাক এবং তৎপরবর্তী মক্কার সমাজে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অপরদিকে দ্বীন-ই-ইলাহির মাধ্যমে হিমালয়ান উপমহাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল রাষ্ট্রনায়ক আকবরের ক্ষেত্রে যেই কথা, বহুবিধ উপকারিতা সামনে রেখে অন্য বহু কুফরির পাশাপাশি তুরস্কের ইতিহাস নির্মাতা প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান (আল্লাহ তাঁকে সত্যের উপর নিয়ে আসুন!)-এর ন্যাটো জোটভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। বিশ্বাস করুন! জাগতিক কল্যাণের ভারে তাওহীদের এসমস্ত অনুপযোগিতা (!) বাস্তবে যে চূড়ান্ত সাফল্য, সে কথা মানুষের সামনে তুলে ধরা খুবই কঠিন।

এক তাওহীদ -এর সামনে গোটা পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবুও তাতে কিছু যায় আসে না। সাত স্তর আসমান এবং সাত স্তর জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে কালিমার পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে—সঠিক সময়ে এ বিষয়টা বোঝার মত মানুষের ভারী অভাব। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্ধের মত (!) তাওহীদ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন যেই অন্ধত্বের (!) কারণে বেলাল, খাব্বাব, আম্মার আর সুমাইয়াদের নির্যাতিত ও নিপীড়িত অবস্থা মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেকমতের উপর আনতে পারে নাই। হে আল্লাহ ! তারা আমাদেরকে অন্ধ আর অপরিণামদর্শী বলে গালি দেয়। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন কারণ তারা বোঝেনা।

Salman Rumi

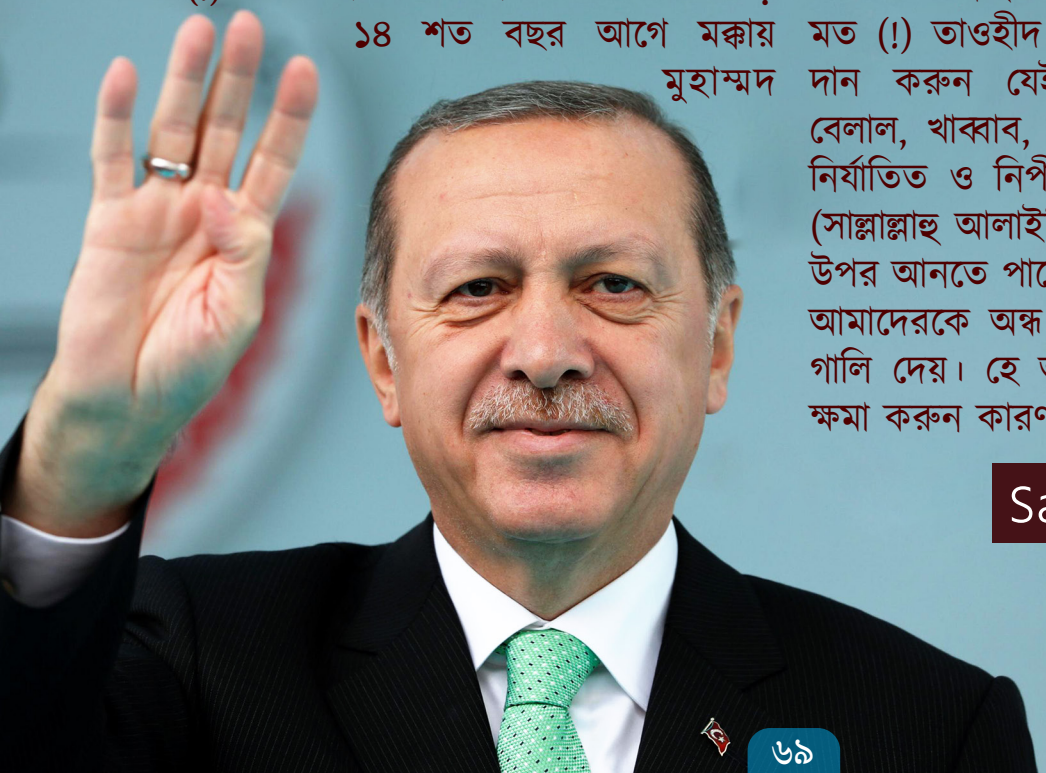

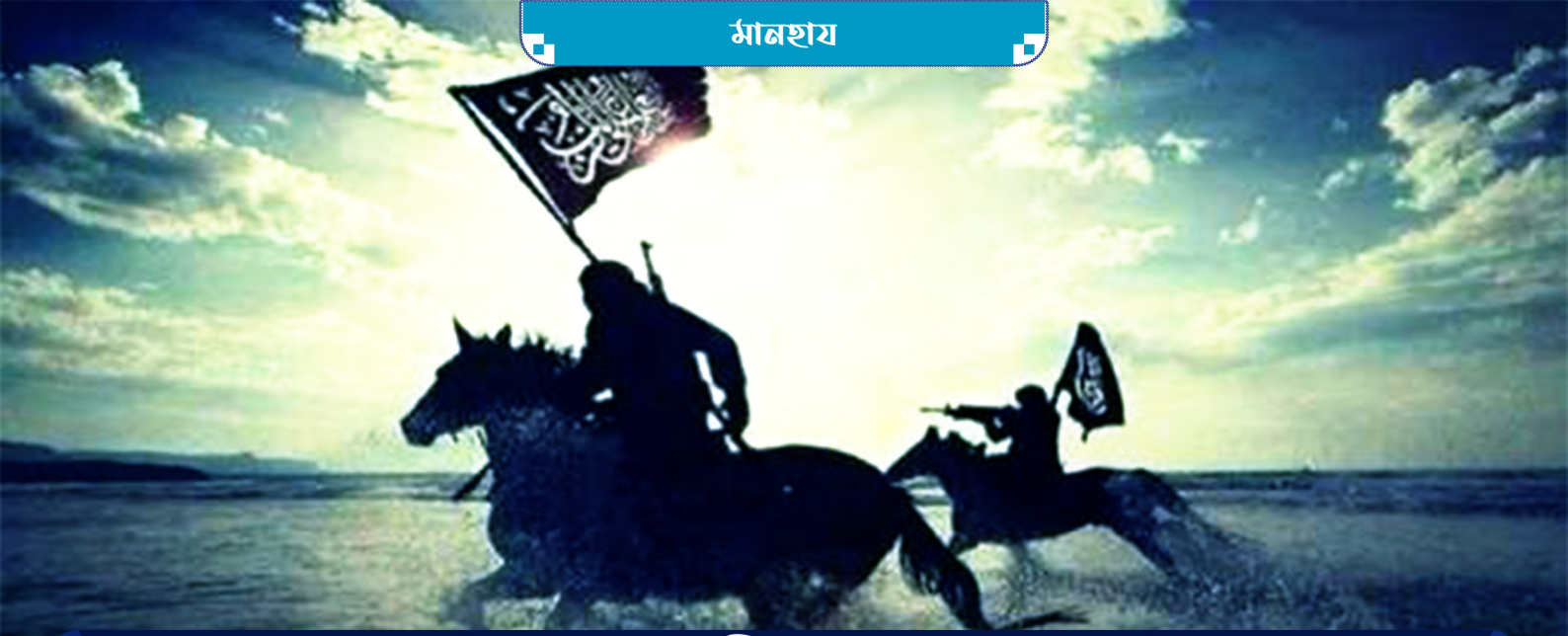

ভাইরাসে নয়, ক্বিতালের মাধ্যমেই মু'মিনদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে

আফসোস আমরা দায়িত্বে অবহেলা করেছি। মুসলিম উম্মাহর সাথে ১০০ বছর যাবত নির্যাতন কারীদের শায়েস্তা করতে পারিনি। আমরা নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছি। পূর্ববর্তী আল্লাহদ্রোহী জাতিদের মালাঈকা দিয়ে শায়েস্তা করা হতো, আর ক্বিতালের বিধান ফরজ হওয়ার পর থেকে ক্বিতালের মাধ্যমে মুসলিমরা শায়েস্তা করতো। আল্লাহ বলেন

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

"ক্বিতাল কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মু'মিনীনদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন।"
(সূরা তাওবা ১৪)

আমরা অধিকাংশ ক্বিতালের ফরযিয়াত ছেড়ে দেওয়ায় আজ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা সূক্ষ্ম ভাইরাস 'করোনা' বাহিনী দিয়ে শায়েস্তা করছেন (আল্লাহু আলাম) এটা আমাদের জন্য অপমানের, এটা উম্মতে মুহাম্মদীর পরিচয়কে ভুলিয়ে দেয়। আমাদের পূর্বসূরিরা কি বদর প্রান্তরে আল্লাহদ্রোহী কুরাইশদের লাঞ্ছিত করেনি? ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান সাম্রাজ্যের কবর রচনা করেনি? উম্মতে মুহাম্মাদীর গর্ব উমার ইবনুল খাত্তাব অগ্নি পূজক মাজুসীদের অপদস্থ করে পারস্য বিজয় করেনি? মুহাম্মদ বিন কাসিম, শাহ জালাল, নিজামুদ্দিন আওলিয়ারা কি গো পূজারীদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাতের মাধ্যমে মু'মিনীনদের অন্তর প্রশান্ত করেনি? সালাহউদ্দিন আইউবীরা কি ক্রুসেডদের অন্তর্জালা আর রক্তের নহর বৃদ্ধি করে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করে মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করেনি? হায় আফসোস! অন্তর প্রশান্তির নিয়ামত থেকে আমরা বঞ্চিত। আর সূক্ষ্ম ভাইরাস সে হক আদায় করে প্রশান্তির নিয়ামত ভোগ করছে। আজ তুমি ভাইরাসের আপডেট জানতে সারাদিন তোমার দৃষ্টি ইন্টারনেটে ছুঁড়ে মারো অথচ তুমি একটি তীর নিক্ষেপ শিখছো না? আসলিহার অভাবে ১০ টা ঢিল তো লক্ষ্যভেদের আশায় নিয়মিত ছুঁড়তে পারো। আল্লাহ এ জন্যই আমাদের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করে বলেন,

"আর যদি তারা (জিহাদে) বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।" [সুরা তাওবা :৪৬]

এই নেটের আপডেট আর লাইক-শেয়ার কি তোমায় স্থায়ী প্রশান্তি দিবে? নাকি তাগুতের খুনে হাত রঞ্জিত করে তৃপ্ত হবে। আমার তো অনেক অনেক তৃষ্ণা, ওরা যতটা মুসলিমের রক্ত শরীর থেকে ঝরিয়েছে, তত গুণ রক্ত আমি ভাসিয়ে তৃষ্ণা মেটাবো।
হে আমার রব! আমাকে তাগুতের ত্রাস হিসেবে কবুল করুন। যেভাবে আপনি সূক্ষ্ম করোনা ভাইরাসকে কবুল করেছেন। নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ভাইরাসের চাইতেও সম্মানিত। কারণ আমি আপনার হাবিব মুহাম্মদে আরাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত।

ওহে ঘুমন্ত শার্দূল জেগে ওঠো, দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও, গোপূজারীর রক্তে জমিন ভাসিয়ে দাও, গাযওয়া হিন্দের এলান পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে দাও আর বলে দাও আগামীকাল তোমাদের নেতাদের হাতে-পায়ে বেড়ি আর গলায় শিকল বেধে নিয়ে যাবো, যেভাবে তোমরা নবী ওয়ারিশ উলামা, আশেকে রসূলদের লাঞ্ছিত করেছ। এটাই মুমিনদের অন্তর প্রশান্তির স্বাদ আস্বাদন করাবে বি ইযনিল্লাহ। ওহে আগামীর সবুজ পাখির রুহ! শুহাদার নেশায় জিল্লতিকে ছুড়ে ফেল, হুর আলআঈনদের সাথে সহবাসের রাস্তা সহজ করো। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমিকরা, হাতে আবার চাপাতি তুলে নাও, রস রাজ আর টুটুল রায়দের পাওনা মিটিয়ে দাও। দেখবে তোমার হাতের ঐ চাপাতিও প্রশান্তি লাভ করবে। আর তুমি ইনশাআল্লাহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করে অনন্তকালের জন্য প্রশান্তি লাভ করবে।

ওহে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রাদিঃ) সন্তানেরা, মায়ের পোশাকের সম্মানে ওদের জীব টেনে ছিঁড়ে ফেলো, যারা নিক্বাবকে তাঁবু (টেন্ট) আর অপসংস্কৃতি বলে। যারা আম্মাজানের চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চায়। হে ভাই প্রস্তুত হোন আল মালহামার জন্য, প্রস্তুত হোন কালো পতাকার অধীনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে, প্রস্তুত হোন সমস্ত তাগুতকে শায়েস্তা করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য। আর কত দিন অলসতায় কাটাবে? সবাই যখন করোনা ভাইরাসে ব্যস্ত, তখনো যুগের হুবাল আমেরিকা দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়ায় ব্যস্ত। ভাই আপনি কি জানেন ৩০০০০ হাজার আমেরিকান আর্মি ও ন্যাটো সোলজার, ২০০০০ যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে পূর্ব ইউরোপে মহড়া করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর আমরা প্রতিনিয়ত ভাইরাসের আপডেটে ব্যস্ত সময় পার করছি, নয়ত হাসি ঠাট্টা ট্রলবাজিতে মেতে আছি, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ এই জাতির যুবকদের অশ্লীলতা থেকে হিফাজত করুন, সবর দান করুন, ইস্তিগফারমুখী করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ইলম, আমল এবং সময়ে বারাকাহ দান করুক আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

কমেন্ট

Bara ibn Malik

ক্বিতালকে নিশ্চিত ভুলে গেছে আজকের মুসলিম উম্মাহ! ইসলামে ক্বিতাল আছে, এ কথাটি অনেকে বিব্রতবোধ করে নাউজুবিল্লাহ। কাফের বন্ধুদের সাথে মেলামেশার সময় তাদের পক্ষ থেকে উড়ে আসে প্রশ্ন তোমাদের ধর্মে নাকি ভিন্ন ধর্মের লোকদের হত্যা করার কথা আছে??? তখন অনেক মুসলিমই মুখ বাকা করে ফেলে ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উত্তর দেয়! আফসোস আজকের মুসলিমদের জন্য, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো একটা ধর্ম মনে করে। আল্লাহ আপনি মুসলিমদের পরিপূর্ণভাবে হিদায়ত দান করুন আমীন। আরাকানের কথা, হিফাজতের রাত্রের কথা, ফিলিস্তিনের কথা, কাশ্মিরের কথা, আরাকান, কাশ্মীর, এই দুইটি জনপদ মুসলিমদের ছিলো। এমন নয় যে, দুটি জনপদ কাফেরদের দখলে ছিলো, কিন্তু কাফেররা দখল করে নিলো। আমাদের ভাইবোনদের নির্মমভাবে হত্যা করলো। দিল্লির কথাও একদিন ভুলে যাবো!। দিল্লিতে এতো নির্মমভাবে হত্যা করলো অথচ আমরা তাদের কিছুই করলাম না। আমাদের বাঙ্গালী মুজাহিদ ভাইদের জন্য উচিৎ হবে দিল্লিকে ও লীগের নেতাদের আগে সাইজ করা। ইন্ডিয়ান পণ্যসহ লীগের যত কোম্পানি আছে সেগুলো বর্জন করা। লীগকে এদেশে দুর্বল করা একান্ত জরুরি। এরাই পরবর্তীতে ত্বাগুতে পরিণত হয়। দেশের লক্ষকোটি টাকা খরচ (ধ্বংস) করে আজকে ত্বাগুত মুজিবের জন্য পূজা করা হচ্ছে! দিল্লির প্রতিশোধ যেকোনো মূল্যে নিতে হবে আমাদের। এরা খুব কৌশলে আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে। আর যারা আশেপাশে আছে তারাও মৃত্যুর ভয়ে প্রতিশোধের নেওয়ার ইচ্ছাও করছে না।

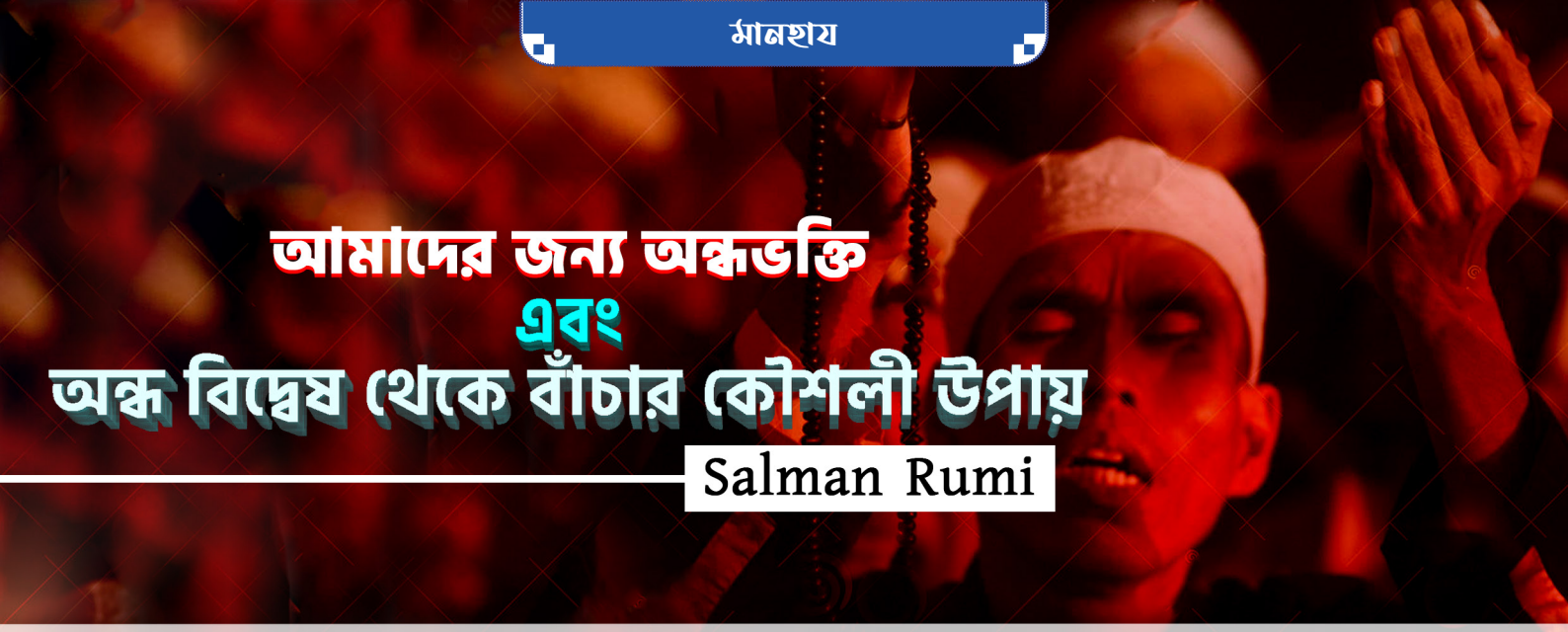

আমাদের জন্য অন্ধভক্তি এবং অন্ধ বিদ্বেষ থেকে বাঁচার কৌশলী উপায়

Salman Rumi

ফেতনায় জরাজীর্ণ এই সমাজে আল্লাহর তৌফিকে আমরা যারা জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাওহীদের মর্ম বুঝতে পেরেছি এবং যারা বুঝতে পারে নাই—সবারই বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে দ্বীনের মেহনত করার ক্ষেত্রে। আমরা আমাদের সত্য বিচ্যুত বড়দের জামাতের বিভিন্ন রকম সমালোচনা করে থাকি। মানুষকে গোমরাহি থেকে বাঁচানোর জন্য নিশ্চয়ই এর প্রয়োজন রয়েছে।

মাঝখানে একটা কথা বলে নেই। অনেক সময় সমালোচনা করতে গিয়ে বড়দেরকে যে গালিগালাজ করা হয়ে থাকে, সে গালিগালাজের দায় অন্ধভক্তদের উপরও বর্তায়। অকারণে গালিগালাজ আমি কখনোই পছন্দ করিনা। একটা মানুষের জাগতিক সম্মানকে মূল্যায়ন করা অবশ্যই শালীনতার শামিল। তারপরও মাঝে মাঝে গালিগালাজ করা হয়ে যায় অন্ধ ভক্তদের কারণে। প্রথমে যখন শালীন ভাষায় কোন জামাতের গোমরাহির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়, তখন অন্ধ ভক্তরা বলে ওঠে—"তারা এত বড় বড় আলেম তারা কি কম বুঝেন?" ব্যাস...তখনই মুখে এসে যায়, "তারাতো পথভ্রষ্ট গোমরা"।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একেকটা ঘরানা নিজেরাই একমাত্র আহলে হক হওয়ার যে দাবি করে, তার হয়তো চার পয়সা মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। কওমি ঘরানার লোকেরা আহলে হাদিসদের কারো থেকে তাওহীদের বিষয়ে সামান্য পান থেকে চুন খসলে যেভাবে অ্যাটাক করেন, নিজেদের ঘরানার কেউ একই কাজ করলে কিংবা তার চাইতে জঘন্য কাজ করলে সে ভাবে অ্যাটাক করেন না বা করার সাহস পান না। একই কথা অন্যান্য ঘরানার ক্ষেত্রেও। নিজ ঘরানার প্রতি একটা আলাদা টান কেন জানি অধিকাংশই কাটিয়ে উঠতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। তো বলছিলাম, এভাবেই অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক কাঁদা ছোড়াছুড়ি ও রেষারেষির পথ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। দাওয়াতের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে। এগুলো অবশ্যই দুঃখজনক।

প্রায়ই দেখা যায়, মূল বিষয় বাদ দিয়ে এমন এমন বিষয় তুলে এনে বিভিন্ন জনের সমালোচনা করা হচ্ছে, যা সমালোচনার কোন কারণ হতেই পারে না। শেষমেশ দেখা যাচ্ছে, আমার অনুসরণীয় কারো থেকেই সেই কারণটা প্রকাশ পাচ্ছে। তখন প্রতিপক্ষের কাছে আমাকে লজ্জিত হতে হচ্ছে। তো আসলে এসব থেকে উত্তরণের কি উপায়? অনেকদিন থেকে মাথায় একটা চিন্তা ঘুরছিল। আমি সেটা খুব একটা সাজাতে পারিনি। তবে চিন্তাটুকু সবার সঙ্গে শেয়ার করা সমীচীন মনে হল।

এই যে আমরা যারা তানজিমের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমরা সবাই কি সবকিছু প্রকাশ্যে করছি? নিশ্চয়ই না। কারণ হলো, পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা। তো এই সীমাবদ্ধতা সব দলেরই রয়েছে। তাহলে কি তাদের গোমরাহির কথা মানুষকে তুলে ধরা আমরা বন্ধ করে দেবো? কখনোই নয়। বরং মানুষকে সচেতন করার জন্য কাজ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমাদের আচরণ উচ্চারণ কেমন হবে? এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন।

তো যে বিষয়টা সামনে রেখে আমরা একজনের সমালোচনা করবো, তা হল—আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, আমার সমালোচনার পাত্র যে ব্যক্তি, তিনি অবশ্যই গোপন কোন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত।

তিনি মনে মনে মুজাহিদদেরকে ভালবাসেন এবং তাদের জন্য বিভিন্ন রকম কাজ করেন। কিন্তু সেটা তারা গোপনে করেন। এটা যখন ধরে নিলাম, এখন তিনি যে ঘরানারই হন না কেন আমাদের মনে তাঁর প্রতি একটা সহানুভূতি জন্মাবে। আর এই সহানুভূতিটাই হচ্ছে ইসলামের সীসা ঢালা ভ্রাতৃত্ব। এ অবস্থায় সকল মুসলমান আমার কাছে সমান হয়ে গেল। এবার সমালোচনার পালা। এখন ওই ব্যক্তির প্রকাশ্য কার্যকলাপের মধ্যে যেটা কুফরি, সেটাকে অবশ্যই কুফরি বলে প্রচার করতে হবে। যেটা গোমরাহি সেটা অবশ্যই গোমরাহি বলে প্রচার করতে হবে। কিন্তু সেই প্রচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে এই অবস্থায় আমার দ্বারা এমন আচরণ উচ্চারণ প্রকাশ পাবে না যা তার ভক্তকুলকে অন্যায়ভাবে আঘাত করতে পারে। আর এমনটা ধরে নেয়াতে আমরা নিজেরাও যাদের অনুসরণের দাবী করে থাকি, তারাও যেহেতু ফেতনা থেকে মুক্ত নন জীবিত থাকা পর্যন্ত, তাই কখনো তাদের থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটে গেলে সেটা বর্জন করতেও আমাদের বাঁধবে না।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি, রজব তাইয়্যেব এরদোগানের সিরিয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করার কারণে অনেকেই অনেকের প্রতি অপবাদ ছুঁড়ে দিচ্ছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এদেশীয় দাওলা সমর্থকদের সঙ্গে আমাদের আচরণ কি হবে? কোন সন্দেহ নেই দাওলার অপরাধের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। কিন্তু তাই বলে তাদের সবকিছুই কি অপরাধ? তাদের শরীয়ত সম্মত কোন কাজের সমর্থন করা হলে একজন কি খারিজি হয়ে যাবে?এত সামান্য কারণে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে পারিনা। আমাদের তনজিম নিশ্চয়ই এই শিক্ষা আমাদেরকে দেয়নি। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দুটো কথা বলি। প্রথমত, খারিজীরা দলগত ভাবে কাফের হওয়ার পক্ষে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত বক্তব্য নেই। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে যারা সমর্থক রয়েছেন, তারা খারেজীদের খারিজি কার্যকলাপের সঙ্গে একমত, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে কিছু কিছু কাজের প্রতি সমর্থন রয়েছে। কিন্তু সেসব কারণে তারাও খারিজি হয়ে যাবে এমনটা নয়।

এ দুটো বিষয় সামনে রেখে দাওলার একজন এদেশীয় সমর্থককে তাগুতদের হাতে ধরিয়ে দেয়া—অন্যদের কথা বলতে পারবোনা—আমি নিজের জন্য কুফরি মনে করি। উপরন্তু তা যদি হয় তাওহীদের কথা বলার কারণে। আল্লাহ আমাকে হেফাজত করুন!

একই কথা অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও। যদিও সেগুলো পথভ্রষ্ট কিন্তু জামাতে ইসলামী, চরমোনাই ইত্যাদি দলগুলোর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তাগুত গোষ্ঠীকে সাহায্য করা আমি আমার ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করি। অনেকগুলো অগোছালো কথা বললাম। তাহকীক করে কোন ভুলত্রুটি পেলে ধরিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল। এটা তেমন তাত্ত্বিক আলোচনা না; জাস্ট কিছু চিন্তা শেয়ার করা, তাই প্রতি কথার সঙ্গে রেফারেন্স দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম না। কারো কোনো বিষয়ে সংশয় পূর্ণ মনে হলে তাহকীক করে জানাবেন ইনশাআল্লাহ!

কমেন্ট
খুররাম আশিক

আঁখি, আপনাকে ধন্যবাদ। খুব সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে এনেছেন। আল্লাহ কবুল করুন আমীন। সমালোচনা নয়, বরং বলা হবে সংশয় নিরসন। ব্যক্তি/ জামায়াতের নাম উল্লেখ না করে আকিদা/ মানহাজ নিয়ে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা। যাতে করে ভুলগুলো ওঠে আসে, এবং উম্মাহ ফায়দা হাসিল করে। শাইখ আইমান আল-যাওয়াহিরী হাফিঃ এর লিখিত (ইসলামী বসন্ত) খুব উপকারী আমার মনে হয়েছে। শাইখও দাউলার ভালো কাজগুলোকে সাপোর্ট করেছেন।

এই যুগের আইয়ুবীর পরিচয়ঃ এসো কাফেলাবদ্ধ হই।

Ubada Ibnus Samit

ড. আবু বকর নাজি হাফিজাহুল্লাহ তার অনবদ্য গ্রন্থ- إدارة التوحش (ম্যানেজমেন্ট অভ স্যাভেজারী) তে শায়খ আবু ক্বতাদা আল ফিলিস্তিনির একটা সুচিন্তিত গবেষণা উল্লেখ করেছেন-যেখানে তিনি বিস্মৃত একটা ধ্রুবসত্য সবার সামনে নতুন করে তুলে ধরেছেন। শায়খ আবু ক্বতাদা (ফাঃআঃ) বলেন-

"যারাই ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন-বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাসটাকে এমন কিছু ব্যক্তি (বা বলা যায় নির্দিষ্ট ক্যারিশমাটিক লিডার) কেন্দ্রিক ভাবে তুলে ধরেছেন - যারা তাদের পূর্ব থেকে চলে আসা বিভিন্ন চেষ্টা সংগ্রামকে একত্রিত করে একটা গোছানো রূপ দিয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করে উৎসাহ তৈরি করে মিশনকে আরো প্রসারিত করেছেন। (ফলে মনে হয় যেন বিজয় টা তার একক প্রচেষ্টা, আজ সেরকম কেউ একজন নেই বলেই বিজয় হচ্ছে না এবং তার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের কারিশমাটাকেই তুলে ধরা হয়, কিন্তু সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কি কি কাজ তাকে করতে হয়েছে,তার সঙ্গীরা কি করেছে, কি কি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে তা তুলে ধরা হয় না।)

ফলে পাঠক ভেবে বসে –ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় বুঝি কোন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, (যেন নুরুদ্দীন জঙ্গি, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীদের হাতে মনে হয় রেডিমেড রাষ্ট্র ছিল-আর সেই রেডিমেড রাষ্ট্রের রেডি সৈন্যরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র ক্রুসেডারদের হারিয়ে দিয়েছে, ব্যাপারটা যদি তাই হতো, ত্যায়লে আমরা ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে আইউবি বা জঙ্গিরে স্মরণ করতাম না, বরং তখনকার আনুষ্ঠানিক আব্বাসী খলিফা যিনি ছিলেন তারেই স্মরণ করতাম,অথচ আমরা- আমি নিজেও - তার নামই জানি না। তা ছাড়া জঙ্গি পরিবারের হাতে যেমন সিরিয়ার কিছু অঞ্চল ছিল- আব্বাসী খেলাফতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসকদের হাতে তো এমন আরো দশটা অঞ্চল ছিল, কই তাগোরে দিয়া তো কাম হয় নাই। জঙ্গি পরিবারও রেডিমেড যা পাইছেন; সেটা দিয়া আগাইতে পারেন নাই, জনগণের মধ্য থেকে দাওয়াহ, তাজনীদ, আর তাহরীদের মাধ্যমে তাকে গেরিলা দল তৈরি করতে হয়েছে, খেলাফতের একজন স্বীকৃতি প্রাপ্ত আঞ্চলিক প্রশাসক হয়েও দীর্ঘদিন ইমাদুদ্দীন জঙ্গি রহঃকে রোহা-বর্তমান লেবাননের কিছু অঞ্চল- বিজয়ের আগে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হয়েছে- এইবার কন, কি কইবেন?

আম জনগণরে জিগাই, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের ছেলের মতো কি খালি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্ররেই জাদুর কাঠি আর সব সমস্যার সমাধান মনে করবেন নাকি যুগের আইয়ুবী মোল্লা উমরের দলে যোগ দিবেন? গেরিলা যুদ্ধ দেইখা নাক সিটকাইয়া কইবেন ময়দান কই, যুদ্ধ কই??!! নাকি আপনিও শরীক হইয়া ময়দান বানানোর মেহনতে নামবেন...গাজওয়া আর সারিয়্যা দিয়ে রাষ্ট্রটাকে প্রসারিত করবেন, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে এক উম্মাহ এক পতাকা এক খিলাফার এই মিশনকে সাহায্য করবেন, স্যাভেজারি কেমনে ম্যানেজ করতে হয় হেইডা শিখ্যা প্রয়োগ কইরা জনগণকে সঙ্গী করে নেবেন, আর তার আগে যেই অঞ্চল এখনো তাগুতের অধীন হেইডারে প্রশাসনশূন্য করবেন-যাতে স্যাভেজারী তৈরি হইলে ম্যানেজ করা যায়।)

যাই হোক, শায়খ বলছেন-সে বিজয়গুলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মাধ্যমে হয়ে গেছে মনে করা "কিন্তু একটা সুস্পষ্ট ভুল ধারণা। বাস্তবতা মোটেই এমন ছিল না। বরং- দেখা গেছে-মুসলমানদের সেই বিপুল সংগ্রাম আর বিশাল বিজয় সম্পন্ন হয়েছে ছোট ছোট অনেক (গেরিলা ও প্রকাশ্য দল) আর এদিক সেদিক ছড়ানো অনেক সামরিক সংগঠনের মাধ্যমে।

(এই গেরিলাগুলারে আইয়ুবী এক পতাকায় আনছেন, দীর্ঘ যুদ্ধ চালাইছেন অনেক বছরের, তার পূর্বপুরুষের সময় থেকেই এটা শুরু হইছিলো-ইমাদুদ্দীন জঙ্গি আর তারপর নুরুদ্দীন জঙ্গির নেতৃত্বে। এমন কইরা কইরা কিছু কিছু অঞ্চল বিজয় হইতে হইতে এক খানা রাষ্ট্রের মতো হইছে, আর শক্ত একখান সেনাবাহিনী খাড়ায়া গেছে। এহনকার আফগানিস্তান তালেবান আর সোমালিয়া আশ শাবাবের লগে মিলাইয়া লন, এরপর আইছে কুদস বিজয়-আমগোও ইনশাআল্লাহ ইলিয়ায় পতাকা গাড়ার দিন আইতাছে বি ইজনিল্লাহ, সুতরাং কাফেলাবদ্ধ হন, শক্ত কদমে লাইগা থাকেন। কি বিশ্বাস হয় না? তেয়লে জবাব দেন-আইয়ুবী কুদস মুক্তির হিত্তিন যুদ্ধ শেষ জীবনে করলেন ক্যান? এত দেরী ক্যান হইল?

তাও বিশ্বাস হইল না? খাড়ান, দলীল দিতাছি। একটু পরেই শায়খ আবু ক্বাতাদা একখান কিতাবের নাম কইব, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলিম এক সেনাপতির, ওইডা পড়লেই বুঝবেন আসল ব্যাপারটা। চলেন, আবার শায়খের কাছে যাই,আসল ব্যাপারটা তাঁর মুখ থেইকা শুনি) হয়তো দেখা গেছে-এখানে একটা ক্রুসেড বিরোধী কেল্লা-কোনো নবাব পরিবার যার শাসনভার পরিচালনা করে আসছে এবং নিজেদের নেতৃত্বে কিছু মানুষ(সৈনিক) জমা করেছে, ওখানে কোনো গ্রাম হয়তো কোনো একজন আলেমকে সেনাপতি মেনে তার নেতৃত্বে জিহাদ (বা গেরিলাযুদ্ধ) শুরু করেছে, অথবা কোনো একজন আলেম তার তালিবুল ইলমদের সঙ্গে নিয়ে একটা মুজাহিদ কাফেলা প্রস্তুত করেছেন, এভাবেই.....

তখনকার এই পরিস্থিতি সবচে ভালো যিনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, সম্ভবত তিনি হচ্ছেন- আমীর উসামা ইবনে মুনকিজ।সে জন্য পড়তে হবে তাঁর লেখা বই الاعتبار। তার পরিবার "আলে মুনকিজরা "ছিলেন শাইজার দুর্গের প্রশাসক। ক্রুসেড যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিপক্ষে তাঁদের রয়েছে বড় ধরনের অবদান। আর তিনি হলেন সরাসরি ময়দানের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। অন্য পয়েন্টে যাওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হল- নুরুদ্দীন জঙ্গি বা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রহিমাহুমুল্লার মতো বড় বড় সেনা নায়কদের মূল অবদানটা ছিল এসব ছড়ানো ছিটানো প্রচেষ্টাকে এক সুতোয় গাঁথা, একত্রিত করা, সুসংগঠিত ও সুসংহত করা, নেতৃত্ব দেওয়া ও পরিকল্পনা করা। কিন্তু দিনশেষে সেসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ওই সব সেনাদল আর তাঁর সৈন্যরাই করেছেন আর সেই জিহাদের মৌলিক একটা ভূমিকা তারা পালন করেছেন। (অর্থাৎ সালাউদ্দিন আইয়ুআী রহিমাহুল্লাহ এর ভূমিকা ৫০ % আর তাদের ভূমিকাও ৫০%, যদি একজন আইয়ুবী না থাকতেন, তবে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হতে পারতো, আবার তাঁর এই নিবেদিত প্রাণ সেনাদল যদি না থাকতো তবে হয়তো আইয়ুবী ময়দানে এক হাজার ক্রুসেডারের সাথে একা জিহাদ করে শাহাদাত লাভ করতেন, কিন্তু হিত্তিনের যুদ্ধের মারহালায় উম্মাহ পৌঁছাতে পারতো না।

এইবার চলেন একটু মিলাই, মাগরিব থেকে মাশরিক, ইন্দোনেশিয়া থেকে মালি, চেচনিয়া থেকে সোমালিয়া- সবাই কিন্তু আজ এক সুতোয় গাঁথা। এই ব্যাপারটা উপনিবেশ আমলে সম্ভব হয় নাই, তাই আমাদের এখানে সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ছিলেন, লিবিয়ায় একজন উমর আল মুখতার ছিলেন, ওই অঞ্চলে সিনুসী আন্দোলন ছিল, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত শাহাদাত ও ইস্তেকামাতের নিআমত পেয়েছি কিন্তু নাসর ও ফাতহ-বিজয় অধরা ছিল,এবং আমাদের তখনকার প্রচেষ্টাগুলো একসময় বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। আজকে আল্লাহর উপর উপর ভরসা করে বলতে ইচ্ছে হয়,-ভয় নেই। আমরা হেরে যাবো না। বিলুপ্তির শিকার হবো না ইনশাআল্লাহ। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, উম্মাহ সঠিক মানহাজেই আছে, সালাহউদ্দীন আইয়ুবীও আছে। প্রথাগত রাষ্ট্র থাক বা না থাক জামাআহ, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদই আমাদের পথ, এই পথে চললে রাষ্ট্র না থাকলে রাষ্ট্র হবে, আর থাকলে আরো বড় হবে। ভয় নাই, আসুন আর দেরী না করে কাফেলাবদ্ধ হই।)

ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, উম্মাহ সঠিক মানহাজেই আছে, সালাউদ্দীন আইয়ুবীও আছে। প্রথাগত রাষ্ট্র থাক বা না থাক জামাআহ, শ্রবণ, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদই আমাদের পথ, এই পথে চললে রাষ্ট্র না থাকলে রাষ্ট্র হবে, আর থাকলে আরো বড় হবে। ভয় নাই, আসুন আর দেরী না করে কাফেলাবদ্ধ হই।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

১. ব্রাকেটের ভিতরের সব কথা আমার নিজের, শায়খের কথা থেকে আলাদা করার জন্য ব্রাকেট ব্যবহার করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট অভ স্যাভেজারী বইয়ের মতনের ইবারত নাকি একটু কঠিন এই জন্য একটু শরাহ করার চেষ্টা করলাম। আল্লাহ ভুলগুলো ক্ষমা করুন।

২. একটু ভিন্ন বিষয়ের লেখা তাই কোথাও কোথাও একটু ভিন্নরকম ভাষা ব্যবহার করেছি। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ।

৩. আমাদের এই লেখাটা banglar omor ভাইয়ের পোস্ট " প্রত্যেক যুগেই সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর জন্ম হয়, কিন্তু.." এর প্রতিক্রিয়ায় লেখা। তাই সম্পূরক লেখা হিসেবে ভাইয়ের পোস্টটাও পড়ে নেওয়ার অনুরোধ।

৪. এই লেখার একটা মাকসাদ এক ফাঁকে শায়খ আবু বকর নাজির ইদারাতুত তাওয়াহহুশ (ইংলিশ-ম্যানেজমেন্ট অভ স্যাভেজারী) আর শায়খ আবু ক্বতাদা আল ফিলিস্তিনির কিতাব بين منهجين বই দুটোর এক ঝলক বিজ্ঞাপন করা। এখনও না পড়ে থাকলে এখনই পড়ে ফেলুন। লিংক দিতে পারমু না ,মিম্বারুত তাওহিদে গিয়ে খুঁজেন, খুঁজতে খুঁজতে আরো কিতাব পড়ে ফেলেন। যেমন العمدة في- إعداد العدة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز বা শায়খ আবু মুসআব আস সুরীর دعوة المقاومة العالمية الاسلامية তারপর حرب المستضعفين.ওইখানে গিয়ে খোঁজাখোঁজি করলে সুস্বাদু আরো অনেক কিছু পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহু ফি সা'য়িকুম।

এখন সময় এসেছে কথাকে আ'মলে পরিণত করার

Abu Yusuf Al Hindi

কোথায় আজ দীনার দিরহামের গোলামরা। এই ডলার, ইউরো আর টাকার নেশায় বুদ হয়ে থাকা জাহেল মুসলিমরা কোথায়? যারা এই দুনিয়ার জিল্লতির লাইফে একটু ভাল থাকার আশায়, জমিনের বুকে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ক্বিতালকে জঙ্গিবাদ প্রমাণ করে তাগুতের কাছে ভাল(!) মুসলিম সাজার চেষ্টা করেছো। নিজেদের আয়েশি জীবনে ব্যাঘাত না ঘটে তাই তোমরা ভুলে গিয়েছিলে মুজাহিদ ভাইদের অসহায় পরিবারকে। গুম, খুন হয়ে যাওয়া ভাইদের ইয়াতিম সন্তান ও আমাদের পর্দানশীন বিধবা বোনদের। একবারও তোমরা জানতে চাওনি তারা কেমন আছে, কোথায় আছে, কি দিয়ে ভাত খাচ্ছে, চিকিৎসা করানোর মত অর্থ হাতে আছে কিনা?

আমরা তাগুতের ভয়ে, সমাজ রক্ষার ভয়ে, জমাকৃত সম্পদের পাহাড়ে অভাব লাগার ভয়ে তাদের ভুলে গিয়েছি। ওয়াল্লহি! সালাত, সিয়াম, ক্বিতাল যেমন ফরয, তেমনি এই প্রতিটি পরিবার, ইয়াতিম সন্তানদের দায়িত্ব ও নিয়মিত দেখাশোনা করাও আমাদের উপর ফরয। নয়ত মৃত্যুর পূর্বে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, বিচার দিবসে আফসোসের কারণ হতে পারে। আপনারা কি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদীছ শুনেছেন?

"যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না, অথবা কোন মুজাহিদকে (জিহাদের সরঞ্জামাদি বা অর্থ দিয়ে) তৈরি করে না, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজ খবর রাখে না (বা দেখাশোনা করে না), আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামাতের আগে আকস্মিক আযাব দিয়ে শাস্তি দিবেন"।[সহীহ,আবূ দাউদ]

শাইখ্ আবু বাসীর রহিমাহুল্লাহ এই হাদীছের ব্যাপারে বলেন: 'তাই কোন মু'মিনের জন্য উল্লেখিত তিন শ্রেণী ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীতে শামিল হওয়া উচিত নয়: হয় সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, অথবা কোন মুজাহিদের রেখে যাওয়া পরিবারের খোঁজ খবর রাখবে (বা দেখাশোনা করবে) অথবা কোন মুজাহিদকে আল্লাহর রাস্তায় তৈরি করবে; অন্যথায় সে তার উপর ক্বিয়ামাতের পূর্বেই(আল্লাহর) আযাব আসার অপেক্ষা করুক; আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই আযাবের বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতি কিরূপ হবে।'

কারণ এখানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ বা কোন মুজাহিদ পরিবারকে সাহায্য করাই মুখ্য বিষয় নয়, বরং এর সাথে এক পুরা মজবুত জিহাদ প্রক্রিয়া জড়িত। একজন মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে যায়; সে যখন দেখে যে, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহতও হই, তাহলে পিছনে আমার সেইসব আন্তরিক প্রিয় ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারকে শুধু আর্থিক সহযোগিতা বা দেখা শোনাই নয়, বরং তাকওয়া, সবর এবং ইস্তিক্বামাতের সবকও শিখাবে। এমনকি প্রয়োজনে শহীদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আল্লাহর দিকে দাওয়াহও দেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে একজন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় আন্তরিকভাবে তাঁর জান কোরবান করতে দ্বিধাবোধ করবে। আমরা কি এটা ভেবে দেখেছি!

আমাদের মুজাহিদ শাইখ আনোয়ার আল আওলাক্বী রহিমাহুল্লাহ তাঁর এক লেকচারে আফসোস করে বলেছেনঃ "ইয়ামানের এক ভাই আমাকে বলেছেন, কোন একজন বোনের স্বামী জিহাদে শহীদ হওয়ার পর, সেই বোন আর্থিক অভাবের সম্মুখীন হন, এমনকি সেই বোন ঈদের দিন মানুষের কাছে তার বাচ্চাদের ঈদের জন্য পুরানো জামা-কাপড় তালাশ করছে। আল্লাহু আকবার! হায় আফসোস আমাদের, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সামনে কি জবাব দেব? আমাদের কি অশ্রুসিক্ত হচ্ছে না! রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী এবং এইসব ভাইদের রক্তের বিনিময়েই তো আজ আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে। কেননা পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ আপনাকে আজ আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার সুযোগ দিয়েছেন, হয়ত এই সুযোগ সব সময় থাকবে না, হয়ত আর আসবেও না।

কেননা, কত সময় আছে যে, আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করিঃ হে আল্লাহ আমাকে আপনার রাস্তায় জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ করার তৌফিক্ব দান করুন; আর যখন আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করেন এবং আর আমাদের সামনে এর সুযোগ খুলে দেন, তখন যদি আমরা দ্রুততা এবং আন্তরিকতার সাথে সাড়া না দেই; তখন কি আমাদের সূরা তাওবার এই আয়াত জানা নেই!

وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿التوبة: ٧٧﴾

"আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই খুব দান-খয়রাত করবো এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। কার্যত: যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং (আনুগত্য করা হতে) তারা গোঁড়ামির সাথেই বিমুখতা অবলম্বন করলো। সুতরাং আল্লাহ তাদের শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক্ব ঢেলে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খিলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা (পূর্ব হতেই) মিথ্যা বলছিল।"
[সূরা আত্-তাওবা(৯): ৭৫-৭৭]

এখন সময় এসেছে কথাকে আ'মলে পরিণত করার। সাদাকাহ কালেকশন, সাদাকাহ প্রদানে অধীনস্থ ভাইদের বেশি বেশি উৎসাহ দেওয়া। নিরাপত্তা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করা, আলিম সমাজের নিকট এর গুরুত্ব তুলে ধরার।

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের ভাই-বোনদের সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর দৃঢ় রাখেন, উম্মাহর মুজাহিদ, গুম-খুন হওয়া আলিম, দাঈ, ত্বলিব ভাইদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার তাওফিক দান করুক, আমাদেরকে নাবী, সিদ্দীক্ব, সালিহীন এবং শুহাদাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে - ২৮

ইলম ও জিহাদ

দশ.

যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়

কতক ব্যক্তির অভ্যাস এমন যে, তারা জালেম শাসকদের দরবারে গিয়ে লোকজনের ব্যাপারে বানিয়ে চিনিয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। এদের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে জালেম শাসকরা নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে। এসব লোকও ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও হত্যাযোগ্য। এদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة – {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: ٨٢]– كما نشاهد. قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ.

"শাইখুল ইসলাম রহ.কে শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীদেরকে এবং জালেমদেরকে বিরতিকালীন সময়ে (হত্যার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।' এর উপর প্রশ্ন করা হল- বিরতিকালীন সময়ে তো তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং আত্মগোপনে থাকে? তিনি উত্তর দেন: 'এ বিরত থাকা তো জরুরতের কারণে। যদি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হত, তাহলে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে তারা পুনর্বার তাতেই লিপ্ত হতো। [আনআম: ২৮] যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, শায়খ আবু সুজা রহ.কে আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দেন: একে হত্যা করা বৈধ এবং তার হত্যাকারী সওয়াবের অধিকারী হবে।" -রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪

অন্যত্র বলেন,

وفي البزازية: أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة ط ملخصا. اهـ

"তাহতাবি রহ. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া থেকে বর্ণনা করেন, ফিতনার সময় জালেমদের সহযোগীদেরকে এবং যারা শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায় মাশায়েখগণ তাদেরকে হত্যা করা জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন।" –রদ্দুল মুহতার ৬/৫৬২

উল্লেখ্য, বিরতিকালীন সময় দ্বারা উদ্দেশ্য- ওয়াল্লাহু আ'লাম- যখন এসব লোক সুবিধা করতে না পেরে আত্মগোপনে থাকে। পরে যখন সুযোগ আসবে আবার ফাসাদ শুরু করবে।

আর ফিতনার সময় দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন মুসলমানদের একক কোনো খলিফা না থাকে। ক্ষমতা নিয়ে নিজেরা মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয় তখন।

মোটকথা, এসব লোককে যখনই পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে। এরা মুফসিদ ফিল আরদ। এদের দ্বারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৯

ইলম ও জিহাদ

এগার. বাগি

একজন খলিফা থাকাবস্থায় বা আহলে হল ওয়াল আকদ একজনের হাতে বাইয়াত দিয়ে দেয়ার পর অন্য কেউ খলিফা দাবি করলে হাদিসে তাকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

"তোমরা এক ব্যক্তির (অর্থাৎ এক খলিফার) হাতে ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে আসে বা জামাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।"

-মুসলিম: ৪৯০৪

অন্য হাদিসে এসেছে,

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

"যদি দুই খলিফার বাইয়াত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দাও।" -মুসলিম: ৪৯০৫

এ হত্যা তা'যির ও সিয়াসতরূপে। এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা না করলে দলাদলি দেখা দেবে। ফিতনা, মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে। সমাজের সার্বজনীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে একজনকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. اهـ

"হত্যা করা ব্যতীত যার ফাসাদ ও অনিষ্ট দমন হচ্ছে না তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। যেমন, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজে যে (নিজেকে খলিফা দাবি করে) বিভেদ ঘটাতে চায়।"

–মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৮-১০৯

এরপর তিনি এর পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল তুলে ধরেন।

বাগিদের ব্যাপারে এখানে কথা বাড়াবো না। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র লেখার ইচ্ছা আছে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- শেষ পর্ব

ইলম ও জিহাদ

শেষকথা

বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি ভুল ধারণার খণ্ডনে লেখাটি শুরু হয়েছিল। তাগুত শ্রেণী ও তাদের দালাল দরবারি মোল্লাদের অপপ্রচার-অপব্যাখ্যার ফলে মুসলিম সমাজে আজ ব্যাপকভাবে এ ধারণা গেঁড়ে বসেছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কাউকে হত্যা করা ইসলাম পছন্দ করে না।

এ মহা ভ্রান্তি দূরীকরণের প্রচেষ্টারূপেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। কি কি কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ বা আবশ্যক হয়ে পড়ে দলীল-প্রমাণসহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখানে যেসব সূরত উল্লেখ করা হয়েছে হত্যার গণ্ডি এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আরও বিভিন্ন সূরত ও কারণ আছে। সকল সূরত একত্রে জমা করা উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটি ইজমালি ও উসূলী ধারণা দেয়া উদ্দেশ্য। আশাকরি আল্লাহ তাআলার তাওফিকে এ কাজটি হয়েছে। আরো বিস্তারিত ফিকহ ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে এবং উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে।

যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এ প্রয়াস শুরু হয়েছিল, এ লেখার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যদি তার কিছুটাও দূর করে দেন তাহলেও আমি সার্থক। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন। একে আমার গুনাহ মাফ ও নাজাতের উসিলা বানান। আমীন।

এক নজরে রিসালার সারমর্ম

ইসলাম কাউকে হত্যার অনুমতি দেয় না কথাটা ভুল। মুসলিম সমাজের দ্বীনি ও দুনিয়াবি মাসআলাহাত রক্ষার্থে শরীয়ত অনেককেই হত্যার অনুমতি দিয়েছে, বরং অনেককে হত্যা করা বাধ্যতামূলক করেছে।

হত্যা শুধু ঐ তিন ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, যাদের কথা এ হাদিসে এসেছে,

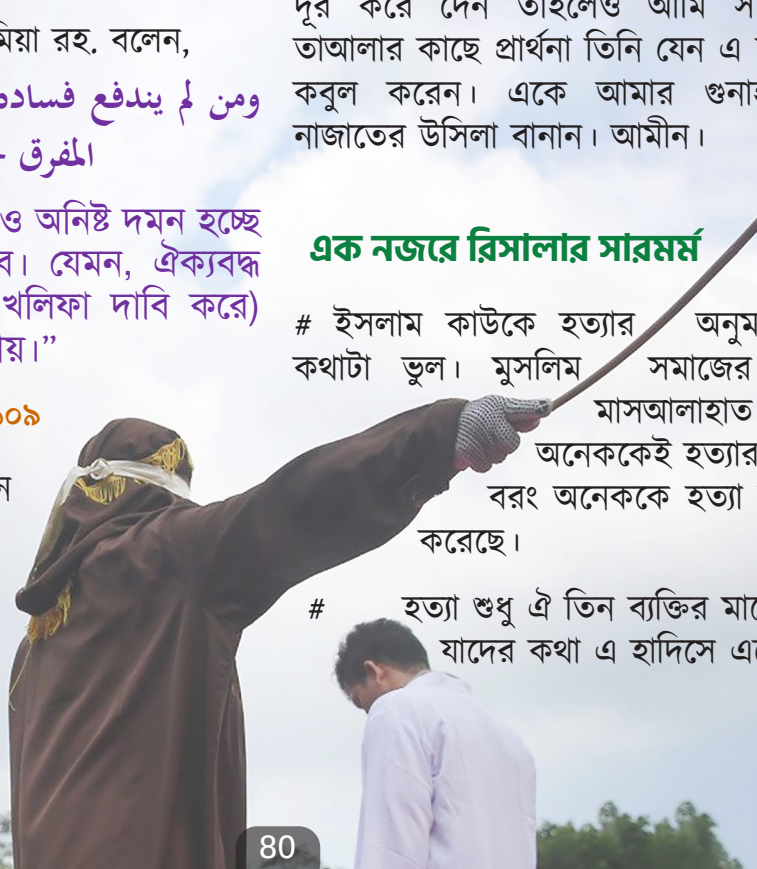

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة.

"যে মুসলমান সাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।"

(সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

এ তিন ব্যক্তি ছাড়াও কুরআন হাদিসে আরো অনেককে হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ হাদিসে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে বিআইনিহি হত্যা করা জরুরী।

 # অস্ত্র প্রয়োগ ইসলামী সমাজের স্থিতিশীলতা ও শান্তি শৃংখলা বজার রাখার জন্য জরুরী। প্রয়োজনে শরয়ী সীমারেখার মধ্যে থেকে জনসাধারণও অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করতে পারবে।

 # আমর বিল মা□রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কিফায়া। সামরিক বেসামরিক সকল মুসলমানের উপর তা ফরয।

 # মৌলিকভাবে মুসলিম হত্যাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,

১. হদরূপে হত্যা।

২. কেসাসরূপে হত্যা।

৩. دفع الصائل তথা জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে হত্যা।

৪. সিয়াসত ও তা'যিররূপে হত্যা।

 # নিম্নোক্ত মুসলিমদের উপযুক্ত শর্ত পাওয়া গেলে হদরূপে হত্যা করা হবে,

১. বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা

২. ডাকাত ও রাহজান

৩. সমকামী

৪. নামায তরককারী

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী

প্রথম দুই শ্রেণীতে সকলে একমত। শেষের তিন শ্রেণী মতভেদপূর্ণ।

 # নিরপরাধ কোনো মুসলিমকে অন্য কোনো মুসলিম ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকেও কিসাসরূপে হত্যা করা হবে।

 # কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমের জান, মাল বা ইজ্জত আব্রুর উপর আঘাত হানলে এবং তাকে হত্যা করা ছাড়া জান, মাল বা ইজ্জত আব্রু রক্ষার উপায় না থাকলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে।

 # মুফসিদ ফিল আরদ তথা যে ব্যক্তি যে দুনিয়াতে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে, হত্যা ছাড়া তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হলে সিয়াসতরূপে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। উক্ত ফাসাদ দ্বীনি দুনিয়াবি যা-ই হোক বিধান সমান।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ফাসাদের কারণে হত্যা করা হবে,

১. যাদুকর: পুরুষ হোক মহিলা হোক। ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলেও হত্যা করা হবে।

২. বিদআতিদের গুরু, যখন তাকে হত্যা করা ছাড়া অনিষ্ট দমন সম্ভব নয়।

৩. যিন্দিক; যে বাহ্যত মুসলমান, ভিতরে ভিতরে কাফের। ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলেও হত্যা করা হবে।

৪. সমকামী, যখন সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী, যখন সে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গম করে।

৭. চোর, যদি বার বার চুরি করতে থাকে।

৮. শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারী বা ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী, যেগুলোতে কিসাস আসে না; যখন এমন হত্যাকাণ্ড একাধিকবার ঘটাবে।

৯. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

১০. একজন খলিফা বিদ্যমান থাকাবস্থায় বা একজনের হাতে খেলাফতের বাইয়াত হয়ে যাওয়ার পর অন্য ব্যক্তি নিজেকে খলিফা দাবি করলে এবং এ দাবি থেকে সরে না আসলে।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

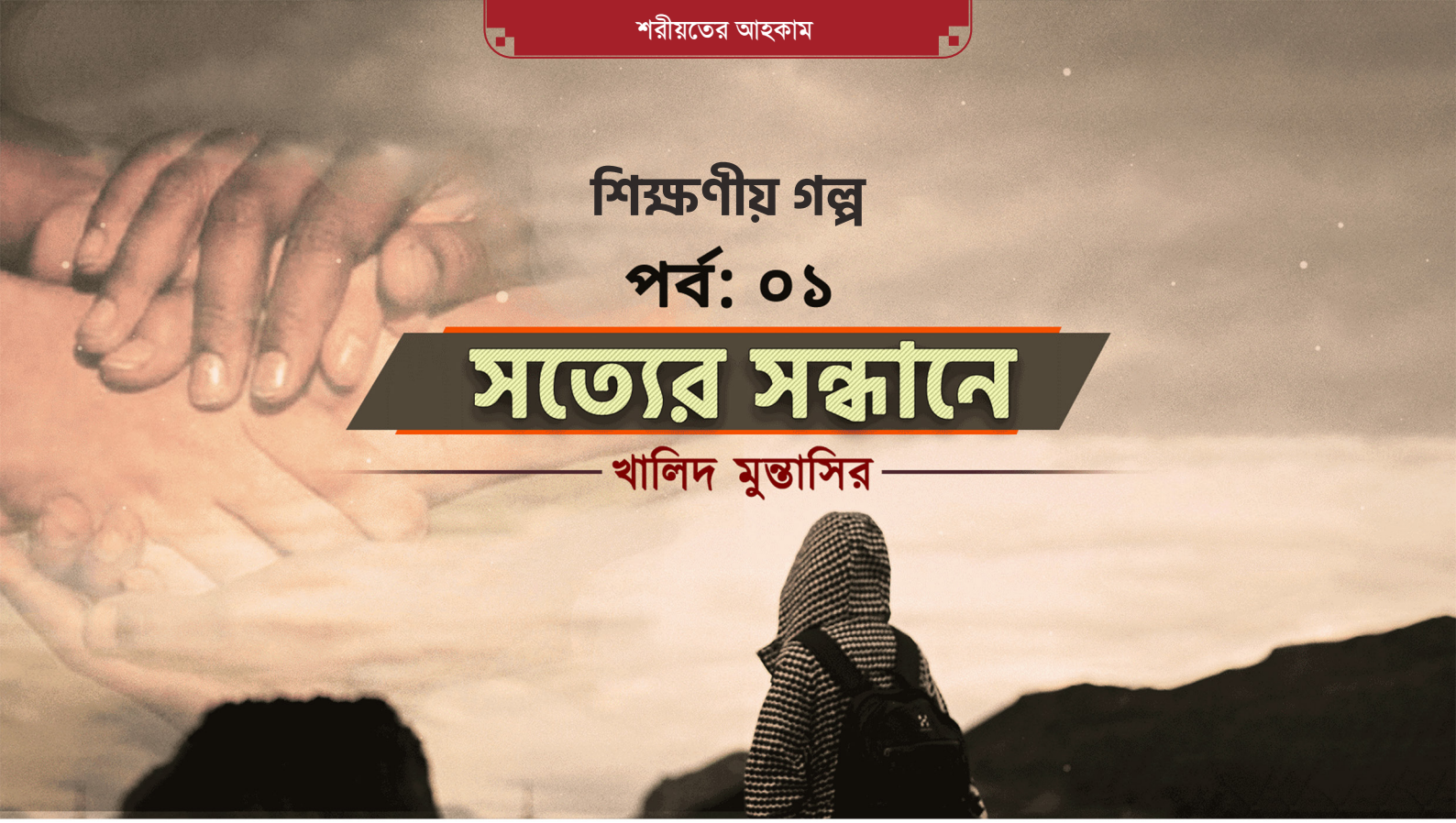

শিক্ষণীয় গল্প

পর্ব: ০১

সত্যের সন্ধানে

খালিদ মুন্তাসির

পড়ালেখার জন্যে গ্রাম ছেড়েছিলাম, সীমান্ত পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম বহুদূর। আজ প্রায় ১৫টি বছর শেষে ফিরে এলাম সবুজ-শ্যামলে ঢাকা সেই গ্রামে। গ্রামের পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মানুষগুলোও পাল্টেছে। চেহারা না; মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাধারা পাল্টেছে। গ্রামের সাদাসিধে অবুঝ কৃষকও আজ পবিত্র কুরআন পড়তে জানে। মসজিদে ঈশার সালাতের পর নিয়মিত পবিত্র কুরআনের পাঠদান শুনে।

আজও ঈশার সালাতের পর মুসল্লিরা নিজ নিজ স্থানেই বসে আছেন। মসজিদের ইমাম সাহেবের কুরআনের দারস শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন তারা। মহল্লার অধিকাংশ লোকই আজ মজলিসে হাজির। বিশাল এই মজলিসের এক কোণে আমার ঠাঁই হয়েছে। আমিও মজলিসের প্রান্তসীমার এক কোণে বসে পবিত্র কুরআনের দারসের প্রতীক্ষায় আছি। ইতোমধ্যেই সকলের সালাত শেষে উঠে দাঁড়ালেন ইমাম সাহেব। হামদ ও দরুদের পর পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

[৩:১০৩]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার।

ইমাম সাহেবের মুখে পবিত্র কুরআনের পবিত্র বাণীর তেলাওয়াত শুনে হৃদয়ে বাল্যকালের সাইফের স্মৃতি জাগ্রত হয়। বাল্যকালের সেই স্কুলবয় সাইফই যে আজকের মুফতি মুহাম্মাদ সাইফ, তা ভাবতেই আমি অভিভূত হই। আনন্দে দুচোখে অশ্রু আসে।

মসজিদের ইমাম সাহেব মুফতি মুহাম্মাদ সাইফ, আমার বন্ধু। বাল্যকালে একসাথে স্কুলে পড়ালেখা করেছি। তাঁর প্রচেষ্টাতেই এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন। আমাদের এলাকায় পূর্বে তুচ্ছ বিষয় নিয়েই মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেতো, মতপার্থক্যের কারণে একে-অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র তাক করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করতো না। আহলে হাদিস-হানাফী দ্বন্দ্ব ছিলো চরমে। কিন্তু, আজ বন্ধু সাইফের প্রচেষ্টায় এলাকায় শান্তির পরিবেশ। আহলে হাদিস, হানাফী, তাবলিগ, জামাআতে ইসলাম-শিবির, চরমোনাইসহ কোনো দল নিয়েই মুসলিমদের মাঝে আর দলাদলি নেই। ইখতেলাফী মাসআলাগুলোতে সবাই নিজ নিজ মতের উপর থেকেই আমল করছেন, কেউ কারো

বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ তুলেন না। এরূপ পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু আমার বন্ধু মুফতি মুহাম্মাদ সাইফের সুনাম-সুখ্যাতি তাই ছড়িয়ে পড়েছে। দূর-দূরান্তেও সবাই মুফতি সাইফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ইতোমধ্যেই কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতের উপর সংক্ষিপ্ত দারস শেষ হলো। আয়াতের বাংলা অর্থ, শানে নুযুল এবং উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকজন ফকিহের অভিমত তুলে ধরেই আলোচনা শেষ করেন মুফতি সাইফ। মজলিস শেষে সবাই চলে গেলেও বসে রইলাম আমি। বন্ধু সাইফের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায়। কত বছর ধরে তাঁর সাথে যোগাযোগ নেই! তাঁকে তুই, তুমি নাকি আপনি সম্বোধন করতাম, তাও সঠিক মনে নেই! তবে, এখন মনে হচ্ছে আপনি বলেই সম্বোধন করা উচিত!

যাইহোক, সবাই চলে যাওয়ার পর সাইফও মসজিদের কোণে অবস্থিত ইমাম সাহেবের জন্য নির্ধারিত ঘরটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। আমি দ্রুত উঠে সাইফের কাছাকাছি গিয়ে সালাম দেই!

"ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।" সালামের জবাব দিয়েই পেছনে তাকায় সাইফ। এ এক অন্যরকম অনুভূতি। দীর্ঘ ১৫টি বছর পর বন্ধুর সাথে বন্ধুর দেখা। চিনতে না পারারই কথা, কিন্তু মসজিদের বাতির আবছা আলোয় আমার দিকে কিছুক্ষণ নজর বুলিয়ে সাইফ জিজ্ঞাসা করে-

"আপনি কি খালিদ?"

"জি হুজুর, আমি খালিদ।" আমার পুরো জবাবের অপেক্ষা না করেই আমাকে জড়িয়ে ধরে সাইফ। কোলাকুলি করতে করতে বলে,

"এতো বছর পর আমাদের কথা মনে পড়লো! আর আমাকে 'হুজুর' ডাকছো কেন? বন্ধু বলো, বন্ধু! 'আপনি' নয় 'তুমি'তেই হবে আমাদের সম্বোধন"

আসলে 'তুমি'তেই তো মধুর ছিল আমাদের বন্ধুত্ব! তাই, আমিও তাঁকে 'তুমি' বলতে দ্বিধা না করে বললাম-

"ঠিক আছে বন্ধু। তো, কেমন আছো তুমি? চাচা-চাচি ভালো আছেন তো?"

"আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন। তোমার কি খবর বন্ধু?"

"আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব্বুল আলামীন আমাকেও বেশ ভালো রেখেছেন।"

"চলো, ঘরে গিয়ে কথা বলি।" হাত ধরে ইমাম সাহেবের নির্ধারিত ঘরে নিয়ে গেলো সাইফ।

ছোট একটা ঘর। একটি চৌকি ও একটি টেবিল রাখার পর ভালোভাবে দাঁড়ানোরও জায়গা নেই সেখানে।

"এতটুকু ঘরেই কি তুমি থাকো, সাইফ?"

"না বন্ধু, এখানে খুব জরুরত ছাড়া থাকা হয় না। বাড়িতেই থাকি। বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন। তাছাড়া স্ত্রী-সন্তানও আছে, আলহামদুলিল্লাহ।"— সাইফের অকপটে জবাব।

"ও আচ্ছা! তাহলে বিবাহও করে ফেলেছো!"

"হুম...আলহামদুলিল্লাহ"

"মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তোমার পরিবারে বরকত দিন, আমীন। তুমি তো মাশাআল্লাহ সবই গুছিয়ে নিয়েছো; ঘর-পরিবার, এমনকি এই গ্রামটাও!"

"সবই মহান রব্বুল আলামীনের মেহেরবানি। আলহামদুলিল্লাহ।"

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে হাসিমুখে সাইফকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"তাহলে বন্ধু, স্কুলে পড়ে মুফতি হলে কীভাবে?!"

"স্কুলে নয়রে ভাই, মাদরাসাতে পড়েই হয়েছি! তুমি যখন লেখাপড়ার জন্য গ্রাম ছেড়েছিলে, আমি ছেড়েছিলাম পড়ালেখা! তারপর, বাবা-মা একরকম জোর করে একটি মাদরাসায় ভর্তি করিয়েছিলেন। মাদরাসার উস্তাদদের সহানুভূতি, সহপাঠীদের ভালোবাসা সর্বোপরি মাদরাসার পরিবেশটাই পরে আমার আপন হয়ে উঠে। সেখানেই কাটে আমার পরবর্তী ছাত্রজীবন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ করুণায় দীর্ঘ ১২-১৩ বছর পড়ালেখার পর তোমার বন্ধু আজ মুফতি!"

"মাশাআল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ। তা বন্ধু, এই উশৃঙ্খল গ্রামটিকে কীভাবে পরিবর্তন করলে? গ্রামের আকাশ-বাতাসও যেন আজ শান্তির গান গায়। নদীটাও শান্ত হয়ে বয়ে চলে! গ্রামের মানুষগুলোর তো ব্যাপক পরিবর্তন। আমার গ্রামটা যেন আজ ইসলামী শাসনের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে! এতো পরিবর্তনের পেছনে মূল ভেদ কী, বন্ধু?"

উচ্ছসিত হয়ে সাইফের তড়িৎ জবাব,

"তাওহীদ ও 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারাআ'র শিক্ষা, বন্ধু। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহর একত্ববাদ ও 'আল-ওয়ালা'র শিক্ষা ও সমাজজীবনে এর বাস্তবায়নেই এই গ্রামের মানুষের মাঝে আজ এতো পরিবর্তন। সকল দলাদলি ভুলে এ গ্রামের মানুষ আজ 'মুসলিম মুসলিমের ভাই' নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। নিজেকে কেবল আল্লাহরই গোলাম মনে করতে শিখেছে, আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা পেতে দিতে সক্ষম

হয়েছে। কাফেরের প্রতি কঠোরতা এবং মুমিনের প্রতি সহানুভূতির যে শিক্ষা আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে দিয়েছেন, তা এই গ্রামের মানুষ আজ রপ্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আর এসকল শিক্ষার প্রতিফলনই এই গ্রামে দেখতে পাচ্ছো, বন্ধু।"

"মাশাআল্লাহ! কিন্তু, এই শিক্ষা অটোমেটিক কাজ করেনি নিশ্চয়?"

"না বন্ধু। আল্লাহর অনুগ্রহে একরকম অটোমেটিকই কাজ করেছে। শিক্ষার সংজ্ঞাটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে!"

"হ্যাঁ, সেই চতুর্থ শ্রেণিতে আব্দুর রহমান স্যারের দেওয়া শিক্ষার সংজ্ঞাটি এখনো মনে পড়ে। স্যার সেদিন বলেছিলেন, 'আচরণের কাঙ্ক্ষিত এবং মার্জিত পরিবর্তনকেই শিক্ষা বলে।' সেদিন কিন্তু শিক্ষার সংজ্ঞাটা তুমি আর আমি ছাড়া অন্য কেউ পারেনি!"

সাইফ হেসে বলে,

"হুম... ঠিক বলেছো! তাহলে বুঝেছো তো, শিক্ষা কীভাবে অটোমেটিক কাজ করে? অর্থাৎ, মানুষের আচরণের মার্জিত পরিবর্তন ঘটলেই কিন্তু সেটাকে শিক্ষা বলা হবে।"

"কীভাবে বন্ধু?"

"এই যেমন, এ গ্রামের মানুষ একসময় 'মাজহাব' নিয়ে ঝগড়া করতো। মুমিনের গায়ে মুমিন হাত তুলতো, গালি দিতো। এখন কিন্তু এগুলো নেই। কেন? কারণ হলো, এই এলাকার মানুষ প্রথমে বুঝতে শিখেছে যে, তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা মুসলিম হয়েছি। মুসলিম হিসেবে অপর একজন মুসলিম তো আমার ভাই। হোক সে হানাফী বা আহলে হাদিস।"

বলে চলেছে সাইফ। আর অপলক নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি আমি, শুনছি নিজ গ্রামের পরিবর্তনের কাহিনী। আজ কিন্তু হাজার মাইল সফরের পর বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ পাইনি। এতো লম্বা সফরের পরও আজ একটু ক্লান্তি আসছে না যে! সাইফের কথার বরকত নিশ্চয়! ছোট্ট ঘরের কোণে একটি জানালা, এর পাশেই আছে বাশবাগান। আর বাশবাগানে রাতের আঁধারকে আলোতে রহস্যময় করে তুলেছে জোনাকির ঝাঁক, তারাও হয়তো আমার সাথে কান পেতে শুনছে মুফতি মুহাম্মাদ সাইফের কথা।

"একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের সাথে কী রকম আচরণ করবে?" আমার জবাবের অপেক্ষা না করে সাইফ নিজেই বলছে,

"এ বিষয়ে সাহাবীদের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-ফাতহের ২৯ নাম্বার আয়াতে বলেন,

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সহচরগণ, কাফেরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল।

তাছাড়াও, সূরা মা'য়িদার ৫৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় দল সম্পর্কে ৬টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। সেখানের ৬টি বৈশিষ্ট্যের একটিও হলো-

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে।

এতোটুকু বুঝেছো বন্ধু?"

মাথা নাড়িয়ে জানালাম বুঝেছি। আমার সাড়া পেয়ে সাইফ আবার বলতে শুরু করলো-

"এখন চিন্তা করো, যে মুসলিম এই গুণটি তথা অপর মুসলিমের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষাটি অর্জন করবে, সে কি মতভিন্নতার কারণে অপর মুসলিমের গায়ে হাত তুলতে পারবে? গালি দিবে? না বন্ধু, দিতে পারবে না। দিতে পারার কথা নয়। তার আচরণে যদি এরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহলেই বুঝা যাবে সে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আর যদি এমন হয় যে, কোন মুসলিম এই শিক্ষাটি অর্জন করেও অপর মুসলিমের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেনি। তাহলে বুঝা যাবে, তার শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা, যে শিক্ষা আচরণের মার্জিত পরিবর্তন করতে পারেনি সেটি শিক্ষার সংজ্ঞানুযায়ী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হতে পারে না।"

"মাশাআল্লাহ। বুঝলাম বন্ধু।" একটু থেমে বিস্ময়ের সুরে বললাম,

"আমাদের গ্রামের সবাই একসাথে এই শিক্ষাটি কীভাবে অর্জন করলো বন্ধু!?"

মুচকি হেসে সাইফ বললো-

"এটা তো এক-দুদিনে হয়নি বন্ধু! মাসের পর মাস গ্রামের মুসলিমদেরকে এই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতে হয়েছে। তবে, এই শিক্ষা অর্জনে একটি প্রক্রিয়া বেশ কাজে এসেছে। সেটি হলো- একপক্ষ চুপ থেকে অপরপক্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে, তাওহীদবাদী বিপরীত পক্ষ একসময় সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য। যেমন ধরো, গ্রামের হানাফী ভাইয়েরা চুপ থেকে আহলে হাদিস ভাইদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলো, তারপরও আহলে হাদিস ভাইয়েরা মাজহাবী ভাইদের নিয়ে গালাগালি করবেন? না, সামান্য মনুষ্যত্ববোধ থাকলেও করবেন না। আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের গ্রামের আহলে হাদিস ভাইয়েরাও

করেননি। তারাও ধীরে ধীরে সহানুভূতিশীল হয়েছেন।”

“আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকাল্লাহু খাইরান বন্ধু। বুঝলাম বিষয়টি। কিন্তু, এখন তো অনেক জায়গায় শুনি একপক্ষ আরেকপক্ষকে কেবল ইখতেলাফী মাসআলার কারণেও কাফের বলে ফেলে!”

“হুম... এ কারণেই তারা একে-অপরের সাথে সহানুভূতির আচরণ করে না, বরং কঠোরতা দেখায়। মুমিনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা যদিও তাদের জানা থাকে, কিন্তু অপরপক্ষের সাথে আচরণ করে কাফেরের মতো। নাভীর নিচে হাত যারা বাঁধেন, তারা নাভীর উপরে হাত বাধনেওয়ালাদেরকে ঘৃণা করেন। আবার, নাভীর উপরে হাত বাধনেওয়ালারা নাভীর নিচে হাত বাধনেওয়ালাদের প্রতি কটুবাক্য ব্যবহার করেন। এগুলো কেবল বাড়াবাড়িই নয়, চরম পর্যায়ের বাড়াবাড়ি। ইখতেলাফী মাসআলায় মতভিন্নতার কারণে কারো সাথে কাফেরের মতো আচরণ করা যায় নাকি? যায় না। এটা সবার বুঝা উচিত। আমাদের গ্রামের মুসলিমরা এটা বুঝেছেন বলেই ‘মুমিনের প্রতি সহানুভূতিশীলতা’র শিক্ষাটি তারা সহজে আত্মস্থ করতে পেরেছেন, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

আর এসকল বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন আলেমগণ। আহলে হাদিস আলেমগণ আহলে হাদিস মতানুসারীদেরকে অন্য মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন। আবার, হানাফী উলামাগণও ভিন্ন মাসলাকের মুসলিমদের প্রতি হানাফী মুসলিমদেরকে সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন। দ্বীনের শাখাগত ইখতেলাফী মাসআলায় যে এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে পারে না, সেটি উলামাগণই তাঁদের অনুসারীদের বুঝাতে পারেন। যেসকল উলামাগণ বাস্তবেই ঐক্য চান, তাঁদের উচিত এ দিকটাতে মনোযোগ দেওয়া।

আর, এখন তো শাখাগত ইখতেলাফী মাসআলার পেছনে পড়ে থাকারই সময় নেই। বরং, তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। কাফেরদের মোকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীরের মতো এক উম্মাহ এক দেহ হয়ে প্রতিরোধ গড়া প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর ইখতেলাফী মাসআলাগুলো নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে, খলিফাতুল মুসলিমীন নিজেই এ বিষয়ে চিন্তা করবেন। কিন্তু আগে তো ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া চাই, তাগুতী শাসনের মূলোৎপাটন করা চাই। আফসোস! মুসলিমরা আজ এদিকে মনোযোগ দিচ্ছে কম, ইখতেলাফী মাসআলা নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। আল্লাহ এ ফেতনা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।”

“ছুম্মা আমীন। আমাদের গ্রামের মুসলিমেরা তো এখন এ ধরণের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, আলহামদুলিল্লাহ।”

“হুম... আলহামদুলিল্লাহ।”

প্রথম দিনেই অনেক কথা হলো। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের কুড়ানো মণিমুক্তা আমাকে দিতে চাচ্ছে প্রিয় বন্ধু সাইফ। আমারও অনেক জানার ছিলো। কিন্তু, এরই মধ্যে বাড়ি থেকে খবর এলো। রাতও অনেক হয়েছে। বাড়িতে যেতে হবে। দীর্ঘ সফর শেষে আজ সন্ধ্যার পরই বাড়িতে এসেছি। পরিবারেও সময় দেওয়া হয়নি এখনো। মা-সহ পরিবারের অন্যরা হয়তো অপেক্ষা করছেন। কিন্তু, মুফতি মুহাম্মাদ সাইফের সান্নিধ্য যে এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করতে ইচ্ছা করছে না! বাল্যকালের স্কুলবয় সাইফের চেয়েও যে মুফতি মুহাম্মাদ সাইফকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছি! কী করি? তাঁকে একটা প্রস্তাব দিয়ে দেখা যাক-

“আচ্ছা বন্ধু, আজ সন্ধ্যার পরই বাড়িতে এসেছি তো। পরিবারে সময় দেওয়া হয়নি এখনো। বাড়িতে সবাই অপেক্ষায় আছেন। চলো বন্ধু, আমার সাথে আমার বাড়ি যাবে চলো!”

“আজ না বন্ধু, অন্যদিন যাবো ইনশাআল্লাহ। আমার জন্যও ওদিকে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানেরা অপেক্ষা করছে হয়তো।”

সাইফের সুস্পষ্ট জবাব। কী আর করার! সাইফের সান্নিধ্য পাওয়ার অপেক্ষায় থেকে আজ বিদায় নিতেই হবে!

“ঠিক আছে বন্ধু। ফজরে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এখন তাহলে বাড়ি যাই।”

“আচ্ছা বন্ধু। দোয়া চাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।”

“ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।”

চলবে ইনশাআল্লাহ... কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে...

[কচি ও কাচা হাতে লেখা এই গল্পে ভুল থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। এই ভুল হতে পারে সাহিত্য-ছন্দে, তত্ত্বে, বানানে। অনুগ্রহপূর্বক এরকম যেকোনো ধরণের ভুল ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলে এবং শুধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো, ইনশাআল্লাহ।]

কমেন্ট

আদনানমারুফ

মাশাআল্লাহ, অত্যন্ত শিক্ষণীয় গল্প। হানাফী ভাইয়েরা যদি আহলে হাদিসদের প্রতি একটু উদার হোন, মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ না করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদের সাথে ঐক্য সম্ভব। বিশেষকরে মুসলিমদের প্রতিরক্ষা, তাগুতদের হটিয়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন এসব মৌলিক বিষয়ের গুরুত্ব তাদের সামনে তুলে ধরা হলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিছু গোড়া আহলে হাদিস আলেমরা আমাদের হতাশ করলেও অন্যরা বিশেষকরে সাধারণ আহলে হাদিস ভাইদের সাথে ঐক্যের প্রচেষ্টা বহাল রাখা উচিত। তাদেরকে ইংরেজদের তৈরী দালাল ইত্যাদি বলে, কিংবা রাফয়ে ইদাইন, আমিন বিল জাহর ও কিরাআত খলফার ইমামের মাসয়ালা নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি করে ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করাই সংগত। আল্লাহ আমাদের বুঝার ও মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

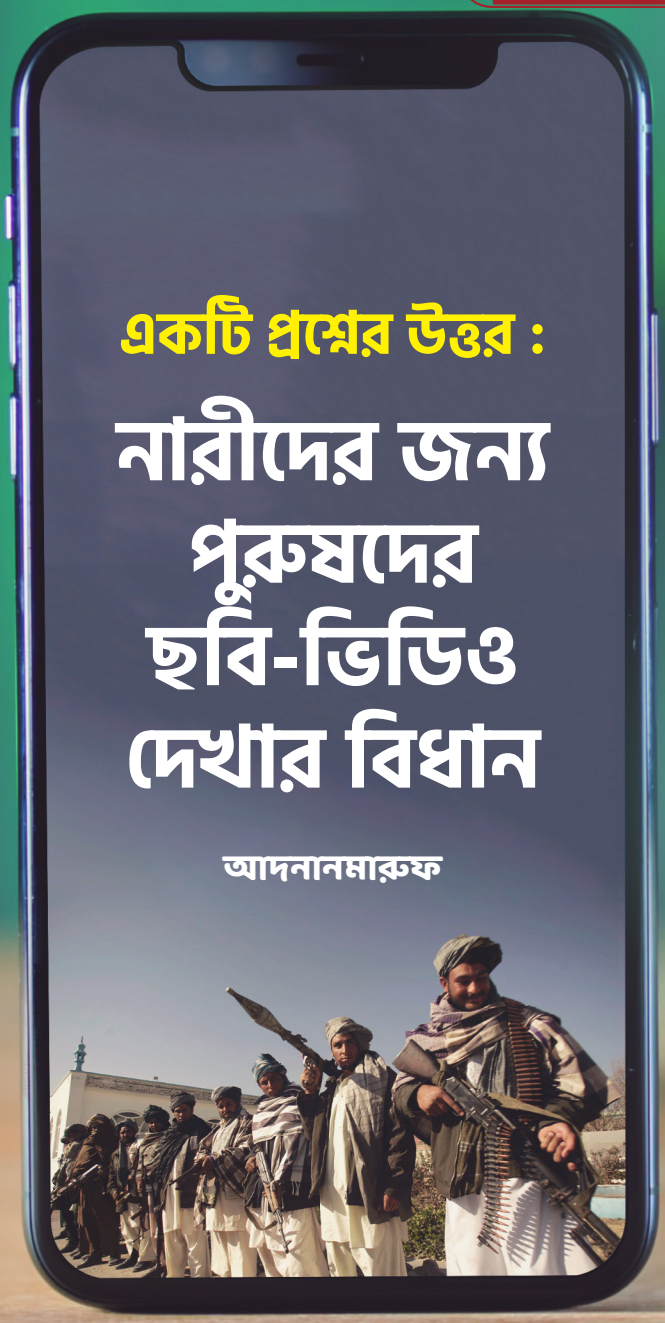

একটি প্রশ্নের উত্তর :

নারীদের জন্য পুরুষদের ছবি-ভিডিও দেখার বিধান

আদনানমারুফ

কিছুদিন আগে এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের বিভিন্ন প্রকাশনা ও ভিডিওতে নারীদের যে ছবি আসে সেগুলো ঢেকে অস্পষ্ট করে দেয়া হয়, কিন্তু পুরুষের ছবি ঢাকা হয় না। অথচ ভিডিও তো নারীরাও দেখেন, তাহলে কি তাদের গুনাহ হবে না?

তো এর উত্তর হলো:- নারীদের জন্য পুরুষদের দেখার ব্যাপারে আলেমদের দুটি মত রয়েছে,

১. নারীদের জন্য পুরুষকে দেখা হারাম, যেমনিভাবে পুরুষদের জন্য নারীদের দেখা হারাম।

২. যদি ফেতনার আশংকা না থাকে তাহলে নারীদের জন্য পুরুষদের দেখা বৈধ।

যেহেতু উভয় মতের স্বপক্ষেই দলিল রয়েছে তাই সাধারণ অবস্থায় নারীদের জন্য সতর্কতার ভিত্তিতে পুরুষদের থেকে দৃষ্টি অবনত রাখাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পুরুষদের যে ছবি-ভিডিও প্রচার করি তা জিহাদের প্রয়োজনেই করে থাকি। এক্ষেত্রে পুরুষদের ছবিও ঢেকে দিলে ছবি-ভিডিওর কোন আবেদন বাকী থাকবে না। আর এসব ছবি-ভিডিওতে সাধারণত আকর্ষণীয় কোন পুরুষের দৃশ্যও না থাকায় ফিতনার আশংকা থাকে না। তাই আশা করি আমাদের বোনেরা শুধু জিহাদের প্রয়োজনে এসব ভিডিও দেখলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি কারো ক্ষেত্রে এসব ভিডিও দেখলেও ফিতনার আশংকা থাকে তবে তার জন্য তা দেখা বৈধ হবে না। আর বিনা প্রয়োজনে এমনিতেই পুরুষদের ছবি-ভিডিও দেখা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

এবার মূল মাসয়ালা উভয় পক্ষের দলিল সহ পেশ করছি:-

সহিহ মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে কয়েস রাযি. কে অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি. এর ঘরে ইদ্দত পালন করতে বলেন। -সহিহ মুসলিম, ১৪৮০

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

قوله: «فإنه رجل أعمى» قال النووي: «احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف نظره إليها، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} {وقل للمؤمنات

حقه، بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عنه خوف الفتنة فقط، وإن لم تكن فتنة فلا» راجع فتح الباري تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم – المجلد الأول (ص: ٧٣١)

"ইমাম নববী রহ. বলেন, 'কেউ কেউ এ হাদিস দিয়ে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন। এ মতটি দুর্বল। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম ও অধিকাংশ সাহাবীর মতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একে অপরের দিকে তাকানো হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, '(হে নবী!) আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে, ... এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে।' (সূরা নূর, ২৯-৩০) তাছাড়া ফিতনার আশংকা তো উভয় পক্ষেই রয়েছে।'

এরপর ইমাম নববী রহ. তার বক্তব্যের স্বপক্ষে উম্মে সালামা ও মাইমুনাহ রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলিল দেন, তারা একদিন রাসূলের কাছে বসা ছিলেন। তখন অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি. রাসূলের নিকট আসলে রাসূল তাদেরকে ভিতরে যেতে বলেন। তারা বললেন, তিনি তো অন্ধ, আমাদের দেখবেন না? রাসূল বললেন, 'তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবে না?' (সুনানে তিরমিযি, ২৭৭৮ ইমাম তিরমিযি রহ. সহিহ বলেছেন)

আর যারা জায়েয হওয়ার মত অবলম্বন করেছেন, তারা সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আয়েশা রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলিল দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলছিল। আমি খেলা দেখে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন।') সহিহ বুখারী, ৫২৩৬)

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'ইমাম বুখারী হাদিসের যে শিরোনাম দিয়েছেন তা থেকে বুঝে আসে, তিনি মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষকে দেখা জায়েয হওয়ার পক্ষে। এটি একটি প্রসিদ্ধ মাসয়ালা। এ ব্যাপারে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মধ্যে কোন মতটি অগ্রগণ্য তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। উল্লিখিত হাদিসটি বৈধতাকে প্রমাণ করে। ইমাম নববী রহ. এর উত্তরে বলেছেন, আয়েশা তখন ছোট ছিলেন, কিংবা তখনোও পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু হাদিসটির কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ ঘটনাটি ঘটেছে হাবশার লোকেরা রাসূলের নিকট প্রতিনিধিরূপে আসার সময়ে। আর তারা

يغضضن من أبصارهن} ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها، تخاف الافتتان به»

ثم احتج النووي بقوله عليه السلام لأم سلمة وميمونة: «أفعمياوان أنتما»؟. ثم قال: «وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز من النظر بلا مشقة بخلاف بيت أم شريك».

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وأما من قال بجواز نظر المرأة إلى الرجل فاستدل بما أخرجه البخاري في باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم عن عائشة قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم". وقال الحافظ تحته: «وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، وقد تقدم في أبواب العيدين جواب النووي عن ذلك، بأن عائشة كانت صغيرة السن دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب ..... ولكن تقدم ما يعكر عليه، وأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب».

«وحجة من منع حديث أم سلمة المشهور: «أفعمياوان أنتما؟» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن، وإسناده قوي. والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة، أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان (مولى أم سلمة) شيء يمنع النساء من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم أعمى، فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به».

ثم قال الحافظ: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات، لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز، فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في

এসেছিলেন নবম হিজরীতে। তখন আয়েশা রাযি. এর বয়স ছিল ষোল বছর, সুতরাং তিনি বালেগাই ছিলেন। আর তখন পর্দার বিধানও অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।'

.....

এরপর হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, মুসলমানদের নিরবিচ্ছিন আমল হলো, মহিলারা নেকাব পড়ে মসজিদ, বাজার ও সফরে বের হয়, যেন পুরুষরা তাদের দেখতে না পায়। কিন্তু মহিলারা যেন পুরুষদের দেখতে না পায় এজন্য পুরুষদের কখনো নেকাব পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এটা পুরুষ-মহিলা দুই শ্রেণীর হুকুম ভিন্ন হওয়ার দলিল। এর আলোকেই ইমাম গাযালী রহ. জায়েয হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, মহিলার জন্য পুরুষের চেহারা দেখা পুরুষের জন্য দাড়িবিহীন বালকের চেহারা দেখার মতো। যদি ফিতনার আশংকা থাকে তবে দেখা হারাম হবে। আর যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তাহলে বৈধ হবে।" -তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ১/১৩৭

উল্লেখ্য, এ মাসয়ালা ব্যাপকভাবে প্রচার করা কাম্য নয়, কেননা বর্তমান যমানা হিসেবে মহিলারাও পুরুষকে দেখতে পারবে না- এ ফতোয়াই মুনাসিব। শরিয়তের সব মাসয়ালা সবসময় প্রকাশ করা ঠিক না। অনেক সময় জাহেল সুবিধাবাদীরা কিছু কিছু মাসয়ালার অপব্যবহার করে থাকে। তাই ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজের প্রচলন, প্রশ্নকারীর অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের বিবেচনা করা জরুরী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক বৃদ্ধ এসে রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন? রাসূল তাকে অনুমতি দিলেন। এরপর এক যুবক এসে হুবহু একই প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে নিষেধ করে দিলেন। –সুনানে আবু দাউদ, ২৩৮৭

অথচ একাধিক সহিহ হাদিসে খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রোযা অবস্থায় স্ত্রীদের চুমো দেওয়ার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। -সহিহ বুখারী, ১৯২৭-১৯২৯ সহিহ মুসলিম, ১১০৬-১১০৮ কিন্তু যেহেতু যুবক স্ত্রীসুলভ আচরণ শুরু করলে নিজেকে এর উপরই সীমাবদ্ধ রাখতে পারবে না। সে আরো আগে বেড়ে যাবে, যা তার রোযা ভাঙ্গার কারণ হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধের অবস্থা ভিন্ন। তাই রাসূল দুজনকে ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন।

তো ফিতনা-ফাসাদের বর্তমান যুগে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতামূলক কোন ফতোয়া প্রচার করা উচিত নয়। মিযানুর রহমান আযহারী নারীদের চেহারায় নেকাব ব্যবহারের ব্যাপারে দলিলের আলোকে যে মতভেদ উল্লেখ করেছেন তা সঠিক হলেও এর প্রচার করাটা ঠিক হয়নি। কারণ এখন এমনিতেই নারীরা নেকাব পড়তে চায় না। আবার যদি তারা শুনে যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে এবং চেহারা খোলা রাখার পক্ষেও দলিল রয়েছে, তো যারা এখন নেকার পড়ে না তারা তো কখনো নেকাব পড়তে চাইবেই না, বরং যারা নেকাব পড়ে তাদের অনেকেই হয়তো নেকাব খুলে ফেলবে। আযহারী সাহেব যতই বলেন, "চেহারা সৌন্দর্যের রাজধানী, তাই আমার নিকট চেহারা ঢেকে রাখার মতটিই রাজেহ-অগ্রগণ্য"- এতে হয়তো খুব বেশি কাজ হবে না।

যেহেতু প্রশ্ন এসেই গেছে, তাই বাধ্য হয়ে উত্তর দিতে হলো। তাছাড়া আশা করি জিহাদের প্রতি আগ্রহী বোনেরা এ ফতোয়ার অপব্যবহারও করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

الجهاد محك الإيمان

জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

পিতার সমীপে সন্তানের বিনম্র জবাব

আহলুস সগুর

এক

মুজাহিদ ভাইয়ের পিতা সন্তানকে সম্বোধন করে বললেন, "জান্নাত জাহান্নামের পথ আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন রাসুল তাঁর হাদিসে বলেছেন"। সন্তান বাবাকে সম্মানের সাথে বললেন, "আপনার বক্তব্য হল আমাদের জিহাদের পথ জান্নাতের পথ নয়। আচ্ছা কুরআন হাদিসের আলোকে জান্নাতের পথটি কোনটি তাহলে! আর সাহাবাগণ জান্নাত কোথায় খুঁজে বেড়াতেন?"

সে ভাইয়ের পিতার প্রতি আমার পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে জান্নাতের পথরেখা তুলে ধরলাম। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে তাঁর দ্বীন বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (٢٤١)

তোমরা কি ধারণা করেছ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ জেনে নিবেন না কে জিহাদ করেছে ও সবর করেছে?

– সূরা আলে ইমরান ১৪২।

হে পিতা! জিহাদ বিহীন তো জান্নাতের কল্পনা করতে নিষেধ করেছেন জান্নাতের স্রষ্টা!

আল্লাহ আরো বলেন,

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩٨)

কিন্তু (মুনাফিকরা জিহাদ না করলেও) রসূল ও তার সাথে ঈমান আনয়নকারীগণ জান মাল দিয়ে জিহাদ করে। তাদের জন্যই সকল কল্যাণ, তারাই সফলকাম। আল্লাহ তাদের জন্য তলদেশে নহর প্রবাহমান জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা মহা সাফল্য। - সূরা তাওবা- ৮৮-৮৯

হে সম্মানিত পিতা! জমিনের বুকে শ্রেষ্ঠ মানব ও তাঁর সহচরগণ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করেছেন। যখন মুনাফিকরা পিছনে পড়ে থাকতে পছন্দ করলো। আল্লাহ তাঁদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রাখার ঘোষণা দিলেন। তো আমরা যদি আল্লাহর প্রস্তুতকৃত সেই জান্নাতে তাঁদের সাথে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের করণীয় কী হবে? তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত নয় কি?

তিনি আরো বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (٦٤١)

অনেক নবী ছিলেন যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে রব্বানী বান্দাগণও লড়াই করেছেন। আল্লাহর রাহে আপতিত মুসীবতের কারণে তারা চিন্তিত হয়ে যায়নি, দুর্বল ও ক্লান্তও হয়নি। আল্লাহ সবরকারীদের ভালবাসেন। -সূরা আলে ইমরান-১৪৬

হে আমার প্রাণপ্রিয় পিতা! অতীতে বহু নবী আলাইহিমুস সালামগণ স্বশরীরে লড়াই করেছেন। রব্বানী বান্দাগণ তাদের সান্নিধ্যে থেকে লড়াই করেছেন বলে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। লড়াই শুধু আমাদের নবী করেছেন এমন নয়। এটা আরো অনেক নবীগণের সুন্নাহ।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٤٧)

যারা দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করতে চায়, তাদের উচিত আল্লাহর রাহে লড়াই করা। যে লড়াই করবে সে শহীদ হোক বা বিজয়ী হোক তাকে মহা প্রতিদান দান করব।

- সূরা নিসা- ৭৪

আমার দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি হিতাকাঙ্খী পিতা! আপনি কি চান না যে, আমি দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে আখেরাত ক্রয় করি? মহা প্রতিদানে সেদিন ধন্য হই? তাহলে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে সেই সাফল্য অর্জনে বাঁধা কেন? আমাকে সাদরে সাজিয়ে দিন সে পথের পথিকদের সাথে।

দেখুন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, আল্লাহ কীভাবে আমাদের সতর্ক করছেন,

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)

যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো, তখন এক শ্রেণীর লোকেরা মানুষকে আল্লাহর ন্যায় বা আরো বেশি ভয় পেতে লাগল। আর বলতে লাগল, আমাদের রব! কেন আমাদের উপর জিহাদ ফরজ করলে? আমাদের পরবর্তীদেরকে ফরজ করে দিতে। হে নবী! বলে দিন, দুনিয়ার উপভোগ তো অল্প। মুত্তাকীদের জন্য আখেরাত শ্রেষ্ঠ। তোমদের সামান্যও জুলুম করা হবেনা।

-সূরা আলে ইমরান-৭৭

তিনি আরো বলছেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٤٢)

যদি তোমাদের বাবা মা, সন্তানাদি, ভাইবোন, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, অর্জিত সম্পদ মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় আছে এমন ব্যবসা, সন্তোষজনক বাসস্থান বা পদ মর্যাদা. এগুলো যদি আল্লাহ রাসূল ও জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা করো। আল্লাহ এমন ফাসেকদের হিদায়াত দান করেন না।

- সূরা তাওবা-২৪।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (٢٥)

বলে দিন, হে কাফেররা! তোমরা কি আমাদের বিজয় বা শাহাদাত এই দুই কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছো? আমরাও অপেক্ষা করছি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব আসার বা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তি দেয়ার। অপেক্ষা করো, আমারাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

- সূরা তাওবা-৫২।

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দানের মতো ব্যবসার পথ দেখাব? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনে জান মাল দিয়ে তার পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে তলদেশে নহর প্রবাহমান জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

- সূরা সফ্- ১০-১১-১২।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে কাফেরদের মারবে ও নিজে শহীদ হবে। তাওরাত ইঞ্জিল ও কোরআনে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যে আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করবে সে তার কেনা বেচার সুসংবাদ গ্রহণ করুক। এটা মহা সাফল্য।

- সূরা তাওবা- ১১১

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (٤)

যারা সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

সূরা সফ্- ৪।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٢١)

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দানের মতো ব্যবসার পথ দেখাব? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনে জান মাল দিয়ে তার পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে তলদেশে নহর প্রবাহমান জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

- সূরা সফ্- ১০-১১-১২।

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)

যে আল্লাহর রাহে লড়াই করে বা শহীদ হয়, তার আমল কিছুতেই তিনি নষ্ট করবেন না। তাকে হিদায়াত দান করে তার অন্তর পরিশুদ্ধ করে দিবেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে জান্নাত তাদের পরিচিত।

-সূরা মুহাম্মাদ 4-৫-৬।

হে আমার পিতা! এটা তো কুরআনের সংক্ষিপ্ত চিত্র। আপনি কুরআন খুলে দেখুন! সমগ্র কুরআন জুড়ে মুজহিদগণের ব্যাপারে কী উল্লেখ করা আছে। শুধু কুরআনে নয়; হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক ী বলেছেন দেখুন!

হাদিসের আলোকে জান্নাতের পথ

واعلموا أن الجنة تحتَ ظلالِ السيوف " متفق عليه.

তোমরা জেনে রাখ! তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত- বুখারী ও মুসলিম।

"إن في الجنَّةِ مائةَ درجةٍ أعدَّها اللهُ للمجاهدين في سبيلِ الله؛ ما بين الدَّرجتين كما بينَ السماءِ والأرض" البخاري.

জান্নাতে একশত স্তর আছে। সবগুলোই আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝের দূরত্ব আকাশ জমিনের দূরত্ব সমান।– বুখারী

" من بَلَغَ العدوَّ بسهمٍ، رفعَ اللهُ له درجةً "، فقال الرحمن بن النَّحَّام: وما الدَّرجةُ يا رسولَ الله؟ له عبد قال:" أما إنها ليست بعَتَبَةِ أُمِّك؛ ما بين الدرجتين مِئةُ عامٍ "رواه النسائي، وابن حبان، صحيح الترغيب والترهيب: ٧٨٢١.

যে এক কদম শত্রুর দিকে অগ্রসর হলো জিহাদের জন্য, এর দ্বারা তার একটি মর্তবা বৃদ্ধি পায়। আব্দুর রহমান বিন নাহহাম জিজ্ঞাসা করলেন, মর্তবা বা দরজা কি? তিনি বললেন, দুই দরজার মাঝে একশত বছরের ব্যবধান। - নাসাই, ইবনে হিব্বান।

" إن للشهيد عندَ الله سبعَ خصالٍ: أن يُغفرَ له في أول دُفعة من دمِه، ويرى مقعدَه من الجنَّة، ويُحلَّى حُلَّة الإيمان، ويُجارُ من عذاب القبر، ويأمن من الفزَعِ الأكبر، ويُوضَع على رأسه تاجُ الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويُزوَّج اثنتين وسبعين زوجة من الحورِ العِين، ويُشَفَّع في سبعين إنساناً من أقاربه "أخرجه ابن حبان، صحيح الجامع: ٧٤٧٣

শহীদের জন্য সাতটি পুরস্কার।

১. শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা জমীনে পড়ার সাথে সাথে সকল গুনাহ মাফ।

২. মৃত্যুর সময় জান্নাতের বাসস্থান দেখিয়ে দেয়া হবে।

৩. কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। ঈমান দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

৪. হাশরের বিভীষিকাময় সময়ে নিরাপদ রাখা হবে।

৫. তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পড়ানো হবে, যার একেকটি পাথর দুনিয়া ও এর মাঝে যা আছে সব

" لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " مسلم.

এই দ্বীন ততক্ষণ টিকে থাকবে, যতক্ষণ একদল মুমিন দ্বীনের জন্য লড়াই করবে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত।

- মুসলিম।

থেকে বেশি মূল্যবান।

৬. বায়াত্তর(৭২) জন হুরে ঈনের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৭. তার নিকটাত্মীয় থেকে সত্তর জনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করা হবে। - ইবনে হিব্বান।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবার! হে পিতা আপনি উক্ত হাদীসে উল্লেখিত কোন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হতে চান?

قال رجلٌ مُقنَّعٌ بالحديد: يا رسولَ الله، أُقاتلُ أو أُسْلِمُ؟ قال: "أسْلِمْ ثم قاتِلْ". فأسلمَ فقاتلَ فقُتِلَ، فقال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم –: "عَمِلَ قليلاً وأُجِرَ كثيراً" متفق عليه.

অস্ত্রে সজ্জিত এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধ করব, না মুসলিম হবো? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মুসলিম হও, তারপর লড়াই করো। সে মুসলিম হলো তারপর লড়াই করে শহীদ হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে অল্প আমলে প্রচুর প্রতিদান পেয়ে গেল।– বুখারী ও মুসলিম।

" من ماتَ ولم يَغزُ، ولم يُحدِّث نَفسَهُ بالغزو، ماتَ على شعبةٍ من نفاق "

أخرجه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٤٨١٢.

যে মারা গেল অথচ যুদ্ধ করেনি, বা যুদ্ধের সংকল্পও করেনি, সে নিফাকের অংশ নিয়ে মারা গেল। - মুসলিম, আবু দাউদ।

والذي نفسُ محمدٍ بيده! لَوَدِدْتُ أن أغزُو في سبيلِ الله فأُقتَلُ، ثمَّ أغزُو فأُقتَل، ثم أغزُو فأُقتَلُ " مسلم.

ঐ স্বত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, অবশ্যই আমি পছন্দ করি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শহীদ হই, আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করে শহীদ হই, তারপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করে শহীদ হই।

- মুসলিম।

" من ماتَ ولم يَغزُ، ولم يُحدِّث نَفسَهُ بالغزو، ماتَ على شعبةٍ من نفاق "

أخرجه مسلم، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٤٨١٢.

যে মারা গেল অথচ যুদ্ধ করেনি, বা যুদ্ধের সংকল্পও করেনি, সে নিফাকের অংশ নিয়ে মারা গেল।

- মুসলিম, আবু দাউদ।

جاء رجلٌ إلى رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم –، فقال: دُلَّني على عملٍ يعدِلُ الجهادَ، قال: "لا أجِدُه". قال: "هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تدخلَ مسجدَكَ، فتقومَ ولا تَفْتُرَ، وتصومَ ولا تُفطِرَ؟" قال: ومن يستطيع ذلك؟! البخاري.

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলতে লাগল, আমাদের এমন আমলের সন্ধান দিন যা নেকী ও সম্মানের দিক থেকে জিহাদের সমতুল্য। তিনি বললেন, আমি এমন আমল পাচ্ছি না। তুমি কি পারবে? যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হয়, তখন মসজিদে প্রবেশ করবে নামায আদায় শুরু করবে কোন বিরতি বিহীন। রোযা রাখা শুরু করবে ইফতারি বিহীন? সে বললো, এটা কি কেউ পারবে নাকি? – বুখারী।

"ما ترك قوم الجهادَ إلا عمَّهم الله بالعذاب" أخرجه الطبراني، السلسلة الصحيحة: ٣٦٦٢.

যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক আযাব প্রেরণ করবেন। - তাবরানী।

" لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة " مسلم.

এই দ্বীন ততক্ষণ টিকে থাকবে, যতক্ষণ একদল মুমিন দ্বীনের জন্য লড়াই করবে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত। - মুসলিম।

হে পিতা! সর্বশেষ আমি আপনাকে বিনয়ের সাথে বলতে চাই, এই পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন কোন পথ নয়, এই পথ কুরআন সুন্নাহের নূরে নূরান্বিত পথ, নবী রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীদের পথ। সুতরাং আমাকে এই পথে বাঁধা দিবেন না। তবুও যদি বাঁধা দিতে চান, তাহলে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন, আমাকে এই পথ থেকে দূরে সরাতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ। এখন আপনি আমাকে যা খুশি করুন।

হে আল্লাহ! আমাকে, আমার বাবা মাকে, পরিবারের সকল সদস্যদেরকে হিদায়াত দান করুন। আমীন।।

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব

[পর্ব-৫ শাসকের পাপাচার ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া]

আদনানমারুফ

[বিগত পর্বসমূহে যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তার দুটি কারণ- নামায ত্যাগ করা ও মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসন করা- নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এ পর্বে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার তৃতীয় কারণ নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।]

যে সকল কারণে শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হয় তার একটি হলো, শাসকের পাপাচার ও অন্যায়-অবিচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া, যার কারণে মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং যদিও জালেম শাসকের বিপক্ষে মূল বিধান হলো, তার জুলুম অত্যাচার সহ্য করে নেয়া- কিন্তু এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তা সীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু যখন তার পাপাচার ও জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তাকে বহাল রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বহুগুণ বেশি হয়, তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. (رد المحتار: ٤٦٢/٤)

"শাসককে অপসারণ করার মত কোন বৈধ কারণ পাওয়া গেলে উম্মত শাসককে পদচ্যুত করতে পারবে। যেমন শাসকের কাজের কারণে যদি উম্মতের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায় কিংবা দ্বীনি বিষয়াদি উলট-পালট হয়ে যায়, তাহলে তাকে অপসারণ করা যাবে। কেননা শাসককে নিয়োগই করা হয়েছিল দ্বীনি বিষয়াদির দেখাশোনা করার

জন্য। (সুতরাং যদি তার দ্বারা দ্বীনের কোন কল্যাণ হওয়ার পরিবর্তে শুধু ক্ষতিই হতে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমতায় রেখে কি লাভ?) তবে যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে যেটা মন্দের ভালো সেটা অবলম্বন করতে হবে। (অর্থাৎ তার দ্বারা যে ক্ষতি হচ্ছে তা যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা-ফাসাদের ক্ষতির চেয়েও বেশি হয় তবে যুদ্ধ করেই তাকে অপসারণ করবে। আর যদি তার কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তাকে অপসারণ করতে গেলে তার থেকেও বেশি ক্ষতির আশংকা থাকে তবে তাকে অপসারণ করবে না।) –রদ্দুল মুহতার, ৪/২৬৪

শাফেয়ী মাযহাবের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী জুয়াইনী রহ (মৃ: ৪৭৬ হি.) বলেন,

فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور، وتعطيل الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم – إن شاء الله عز وجل – وذلك أن الإمامة إنما تعنى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة. وترك الناس سدى، ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون الظالمين، وملاذ الغاشمين، وموئل الهاجمين، ومعتصم المارقين الناجمين، وإذا دفع الخلق إلى ذلك، فقد اعتاصت المسالك، وأعضلت المدارك، فليتئد الناظر هنالك، وليعلم أن الأمر إذا استمر على الخبال، والخبط والاختلال، كان ذلك لصفة في المتصدي للإمرة، وتيك هي التي جرت منه هذه الفترة، ولا يرتضي هذه الحالة من نفسه ذو حصافة في العقل، ودوام التهافت في القول والفعل مشعر بركاكة الدين في الأصل، أو باضطراب الجبلة، وهو خبل، فإن أمكن استدراك ذلك، فالبدار البدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبها وتميل من مناصبها، وتميد خطة الإسلام بمناكبها. (غياث الأمم في التياث الظلم ص: ٧٠١ ط. مكتبة إمام الحرمين: ١٠٤١)

শাসকের কাজের কারণে যদি উম্মতের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায় কিংবা দ্বীনি বিষয়াদি উলট-পালট হয়ে যায়, তাহলে তাকে অপসারণ করা যাবে।

"যদি শাসক সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে; তার জুলুম-অত্যাচার ব্যাপক হয়ে যায়; যমিনে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে; মানুষের হক বিনষ্ট হয়; হুদুদ-কিসাস পরিত্যক্ত হয়; .... যালেমদের দুঃসাহস বেড়ে যায়; মাযলুম যালেম থেকে হক উদ্ধার করার মত কাউকে না পায়; গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়; সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে; তখন এই ভয়াবহ বিষয়ের প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা শাসককে নিয়োজিত করা হয় এর বিপরীত উদ্দেশ্যে। সুতরাং যখন শাসক থেকে উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্যাবলী ঘটতে থাকে তখন তার প্রতিকার করা জরুরী।

জনগণকে শাসকবিহীন ভাবে ছেড়ে রাখা এমন শাসকের অধীনে রাখার চেয়ে উত্তম যে যালেমদের সহায়ক, অপরাধীদের আশ্রয়দাতা, দুর্বৃত্তদের রক্ষাকারী। যদি মানুষকে এমন শাসকের অধীনে থাকতে বাধ্য করা হয় তবে তো বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করবে। সুতরাং যে এ মাসয়ালা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে যেন গভীরভাবে ভেবে দেখে এবং জেনে রাখে যে, মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়ার বিরামহীন অধঃপতন শাসকের খারাবীর কারণেই হয়ে থাকে। তাই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। .... সুতরাং যদি এর প্রতিকার করা সম্ভব হয় তবে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেয়া দরকার।" -গিয়াসুল উমাম, পৃ: ১০৭

উযীর ইয়ামানী রহ. (মৃত্যু: ৮৪০ হি.) বলেন,

الفصل الثاني: في بيان أنّ منع الخروج على الظّلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه، وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد بن معاوية، والحجّاج بن يوسف، وأنّه لم يقل أحدّ منهم ممّن يعتدّ به بإمامة من هذه حاله، وإن ظنّ ذلك من لم يبحث، لإيهام ظواهر عباراتهم في بعض

الموضع، فقد نصّوا على بيان مرادهم وخصّوا عموم ألفاظهم، فممّن ذكره الإمام الجويني ....) ثم ذكر رحمه الله قول الجويني رحمه الله المارُّ آنفا. (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، ٢/١٨٣ ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع).

"যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না' এ বিধান এমন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার শাসনের ক্ষতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। যেমন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। উল্লেখযোগ্য কোন আলেম এমন শাসকের শাসনকে বৈধ বলেননি। যদিও তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক বিবরণ হতে কখনো কখনো এমন সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা তারা (অন্যত্র) নিজেদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যারা এ বিষয়টা উল্লেখ করেছেন তাদের একজন হলেন ইমাম জুয়াইনী ...।" এরপর তিনি ইমাম জুয়াইনী রহ. -র উপরোক্ত বক্তব্য নকল করেন। -আলরওযুল বাসেম, ২/৩৮১

আলী রাযি. বলেন,

عن ليث قال: قال علي بن أبي طالب: «لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر»، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: «إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبي به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله». رواه الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان (٢٠١٧) وروى ابن أبي شيبة نحوه في «المصنف» (٦٨٠٩٣) بإسناد آخر، وقال الشيخ عوامة حفظه الله في تعليقه على المصنف: (إسناده حسن، إن كان حبيب العبسي هو ابن سليم المترجم في التهذيبين).

"মানুষ শাসক ব্যতীত সুষ্ঠুরূপে জীবনযাপন করতে পারে না, চাই শাসক নেককার বা ফাসেক। লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! নেককার শাসকের প্রয়োজনীয়তা তো আমরা বুঝি, কিন্তু ফাসেক শাসক থাকার কি প্রয়োজন? আলী রাযি. বললেন, ফাসেক শাসকের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা পথ-ঘাট নিরাপদ রাখেন, তার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে জিহাদ জারী থাকে; কর-ট্যাক্স আদায় হয়; হুদুদ-কিসাস কায়েম হয়; (তার ব্যবস্থাপনায়) হজ হয় এবং মুমিন তার শাসনাধীনে মৃত্যু পর্যন্ত নিরাপদে ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকে।" -শুয়াবুল ইমান, ইমাম বাইহাকী রহ. হাদিস নং:- ৭১০২ ইবনে আবী শাইবা রহ. ভিন্ন সনদে কাছাকাছি অর্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ৩৯০৮৬।

হাসান বসরী রহ. বলেন,

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. (جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ٢/٧١١ ط. مؤسسة الرسالة)

"শাসকরা আমাদের পাঁচটি জিনিষের যিম্মাদারী পালন করে:- জুমা, জামাত, ইদ, সীমান্তরক্ষা ও হুদুদ-কিসাস কায়েম করা। আল্লাহর শপথ তাদের দ্বারাই দ্বীন ঠিক থাকে। যদিও তারা জুলুম-অত্যাচার করে, কিন্তু তাদের দ্বারা যে লাভ হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশি।"

যালেম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা যাবে না' এ বিধান এমন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং তার শাসনের ক্ষতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে।

এখানে লক্ষণীয়, আলী রাযি. ও হাসান বসরি রহ. জালেম শাসকের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করছেন এবং তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করছেন এ কথা বলে যে, তাদের দ্বারা শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা হয়। চোর-ডাকাত নির্মূল হওয়ার কারণে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবনযাপন নিরাপদ হয়। মুমিন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। জালেম শাসকদের দ্বারাও হুদুদ কায়েমের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়াদি সম্পাদিত হয় এবং তাদের দ্বারা যা কল্যাণ সাধিত হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশী। কিন্তু বর্তমান শাসকদের দ্বারা যেহেতু জিহাদ, সীমান্তরক্ষা-হুদুদ কায়েম ইত্যাদি কিছুই হচ্ছে না। বরং উল্টো তারা আইন করে হুদুদ কায়েম করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকেই আজ চোর-ডাকাত-চাঁদাবাজ ও দলীয় ক্যাডাররা মানুষদের যিম্মী করে রেখেছে। শত্রুর সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা তো তাদের দ্বারা হচ্ছেই না, বরং উল্টো তারাই শত্রুর সাথে গলাগলি করে দেশকে ধীরে ধীরে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও

অর্থপাচার করে দেশ ও জাতিকে ফতুর বানিয়ে দিচ্ছে। ওদের মাধ্যমে মুমিন নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারা তো দূরে থাক- বরং ওদের কারণেই আজ মুমিনের দুনিয়া-আখেরাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। যদি মেনে নিই ওদের দ্বারা দুনিয়াবী কিছু কল্যাণ হচ্ছে, তবুও ওদের দ্বারা যে অকল্যাণ হচ্ছে (বিশেষ করে মানুষের দ্বীনি বরবাদি যা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণ হতে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ) তা ওদের দ্বারা হওয়া কল্যাণের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তাই বর্তমান শাসকদের ফাসেক বলা হোক বা মুরতাদ- সর্বাবস্থায় ওদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে।

দেখুন, উলামায়ে কেরাম মোল্লা উমরের নেতৃত্বে তালেবানদের জিহাদকে সমর্থন করেছেন। অথচ তালেবানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। বরং তালেবান প্রতিষ্ঠাই হয়েছে রাশিয়া আফগান ছেড়ে চলে যাওয়ার পর। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী আফগান কমান্ডাররা যখন আফগানিস্তানে যুলুমের রাজ্য কায়েম করে, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন মোল্লা উমর এই কমান্ডারদের বিপক্ষে জিহাদ শুরু করেন। অথচ তখন আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দীন রব্বানী ছিল। যদিও তার ক্ষমতা দুর্বল ছিল। (মোল্লা উমরের আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও তালিবান, মাওলানা উবাইদুল্লাহ নদভী, পৃ: ১৯-৩৭)

পাকিস্তানের বরেণ্য আলেম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহিদ রহ. বলেন,

جہاں تک مجھے معلوم ہے طالبان کی تحریک صحیح ہے، أفغانستان کی جن جماعتوں أور ان کے لیڈروں نے روس کے خلاف لڑائی کی وہ تو صحیح تھی، لیکن بعد میں ان لیڈروں نے اپنے اپنے علاقہ میں اپنی حکومت بنائی- اور ملک میں طوائف الملوکی کا دور دورہ ہوا، ملک میں نہ امن قائم ہوا، نہ پورے ملک میں کوئی مرکزی حکومت قائم ہوئی، نہ اسلامی نظام نافذ ہوا-

طالبان نے جہاد افغانستان کو رائگان ہوتے ہوئے دیکھا تو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے تحریک چلائی، اور جو علاقے ان کے زیر نگیں آئے ان میں اسلام نظام نافذ کیا، افغانستان کے تمام لیڈروں کا فرض تھا وہ اس تحریک کی حمایت کرے، مگر وہ طالبان کے مقابلہ میں آگئے، اب افغانستان میں لڑائی اس نکتہ پر ہے کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو یا نہیں؟ طالبان کی تحریک اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہے اور ان کے مخالفین کی حیثیت باغیوں کی ہے، اس لئے طالبان کے جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جان دیتے ہیں بلا شبہ وہ شہید ہیں- آپکی مسائل : (٧/ ٥٧٣ – ٦٧٣ ط. مکتبۃ لدھیانوی ١٤١١ھ)

"আমার জানামতে, তালেবানদের (জিহাদি) আন্দোলন সঠিক। আফগানিস্তানে যে দল ও তাদের নেতারা রাশিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলো তাদের যুদ্ধ তো ঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ এলাকায় সরকার গঠন করে। দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তুলে পরস্পর হানাহানি শুরু করে। ফলে দেশে কোন নিরাপত্তা ছিলো না, পুরো দেশে কোন কেন্দ্রীয় সরকারও গঠিত হয়নি, ইসলামী আইনও বাস্তবায়িত হয়নি।

তালেবানরা আফগান জিহাদ নিষ্ফল হতে দেখে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য (জিহাদি) আন্দোলন শুরু করে। যেসব এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে তাতে ইসলামী শাসন চালু করে। সকল নেতার কর্তব্য ছিলো, এই আন্দোলনের সাহায্য করা। কিন্তু তারা সাহায্যের পরিবর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামী আইন বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হচ্ছে। তালেবানদের আন্দোলন ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আর তাদের বিরোধীরা হচ্ছে বিদ্রোহী। সুতরাং তালেবানদের মধ্য হতে যারা নিহত হবেন তারা আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ করার জন্যই নিহত হবেন। তাই নিঃসন্দেহে তারা শহিদ বলে গণ্য হবেন।" -আপকে মাসায়েল, ৭/৩৭৫-৩৭৬

চলবে ইনশাআল্লাহ

***

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-১ প্রথম ক্ষেত্র- নামায পরিত্যাগ করা)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-২)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৩ দ্বিতীয় ক্ষেত্র- মানবরচিত বিধান দ্বারা দেশ শাসন করা)

যে সকল ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব (পর্ব-৪ আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. এর মত পর্যালোচনা)

الجهاد محك الإيمان

জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

আলী রাযি. ও হাসান বসরি রহ. জালেম শাসকের আনুগত্য করতে উৎসাহিত করছেন এবং তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করছেন এ কথা বলে যে, "তাদের দ্বারা শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা হয়। চোর-ডাকাত নির্মূল হওয়ার কারণে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবনযাপন নিরাপদ হয়। মুমিন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে পারে। জালেম শাসকদের দ্বারাও হুদুদ কায়েমের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়াদি সম্পাদিত হয় এবং তাদের দ্বারা যা কল্যাণ সাধিত হয় তা তাদের ক্ষতির চেয়ে বেশী।" কিন্তু বর্তমান শাসকদের দ্বারা যেহেতু জিহাদ, সীমান্তরক্ষা-হুদুদ কায়েম ইত্যাদি কিছুই হচ্ছে না। বরং উল্টো তারা আইন করে হুদুদ কায়েম করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের ছত্রছায়ায় থেকেই আজ চোর-ডাকাত-চাঁদাবাজ ও দলীয় ক্যাডাররা মানুষদের যিম্মী করে রেখেছে। শত্রুর সাথে জিহাদ ও সীমান্ত রক্ষা তো তাদের দ্বারা হচ্ছেই না, বরং উল্টো তারাই শত্রুর সাথে গলাগলি করে দেশকে ধীরে ধীরে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও অর্থপাচার করে দেশ ও জাতিকে ফতুর বানিয়ে দিচ্ছে। ওদের মাধ্যমে মুমিন নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করতে পারা তো দূরে থাক- বরং ওদের কারণেই আজ মুমিনের দুনিয়া-আখেরাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। যদি মেনে নিই ওদের দ্বারা দুনিয়াবী কিছু কল্যাণ হচ্ছে, তবুও ওদের দ্বারা যে অকল্যাণ হচ্ছে (বিশেষ করে মানুষের দ্বীনি বরবাদি যা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কল্যাণ-অকল্যাণ হতে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ) তা ওদের দ্বারা হওয়া কল্যাণের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তাই –

বর্তমান শাসকদের ফাসেক বলা হোক বা মুরতাদ-সর্বাবস্থায় ওদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে।

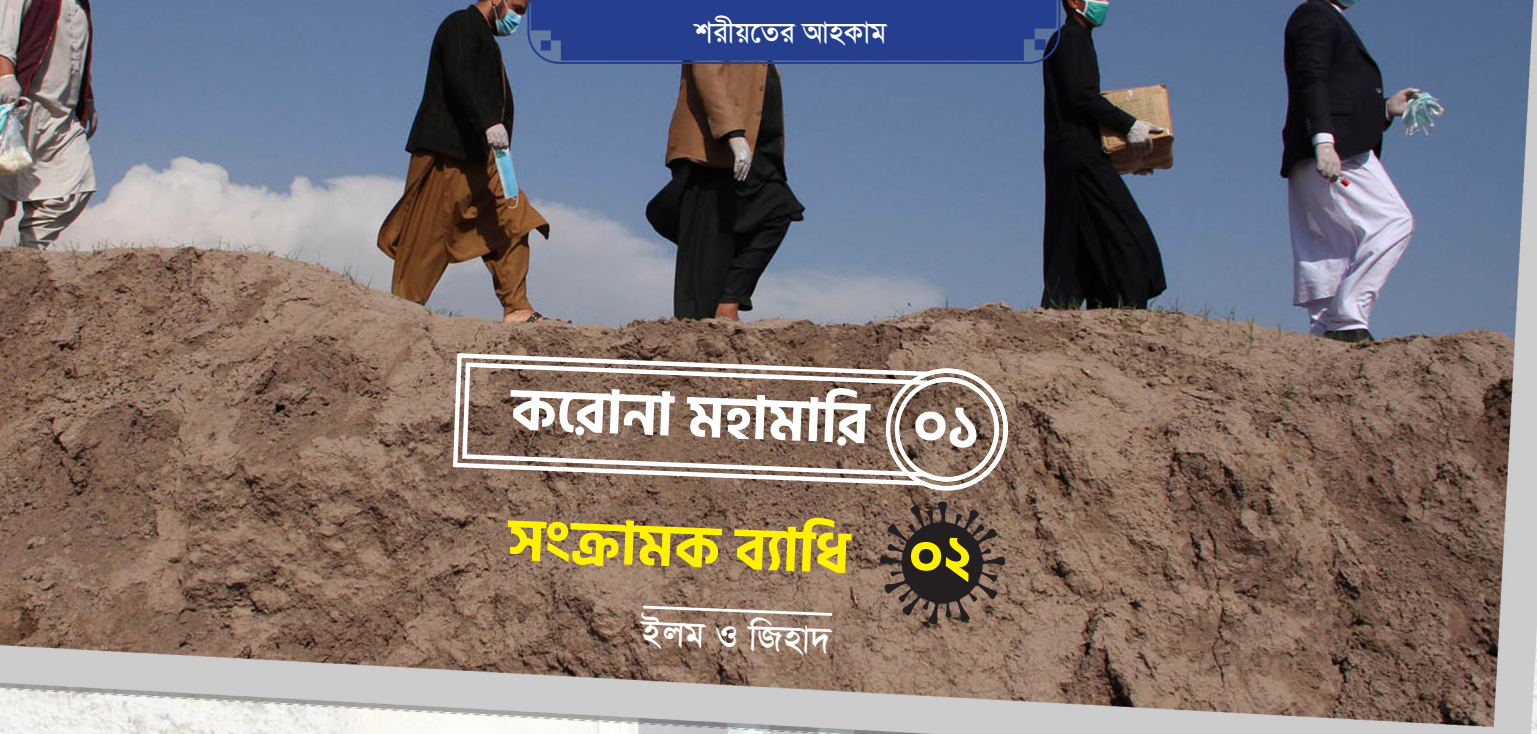

করোনা মহামারি ০১

সংক্রামক ব্যাধি ০২

ইলম ও জিহাদ

গত পর্বে আমরা রোগের সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে, সংক্রমণ ইসলামী আকীদার পরিপন্থী নয়। আর ইসলাম যে সংক্রমণ অস্বীকার করেছে সেটা হলো জাহিলি আকিদার সংক্রমণ, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই রোগ বিস্তারের শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইসলাম এটি অস্বীকার করেছে। ইসলামের আকীদা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না। রোগের সংক্রমণও আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে।

সংক্রমণ নিয়ে ইনশাআল্লাহ এ পর্বে আরেকটু আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে আমরা আজ দু'টি হাদিস নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হাদিস ০১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل

"সাপ মেরে ফেলবে। বিশেষত পিঠে শুভ্র দুই রেখাবিশিষ্ট সাপ এবং লেজকাটা সাপ মেরে ফেলবে। কেননা, এ দু□টি দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত করে দেয়।" -সহীহ বুখারি ৩১২৩

এ দু'টি সাপ এমনই বিষাক্ত যে, এদের দিকে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্থ বাচ্চা তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

> "তা'ছির হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়। তা শুধু শারীরিক সংস্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কখনও এভাবেও হতে পারে আবার কখনও মুখোমুখী হওয়া এবং কখনও শুধু তাকানোর দ্বারাও হতে পারে।

দেখার বিষয় যে, সাপে কামড় দেয়নি। দূরে থেকে শুধু তাকিয়েছে। এতেই এমন প্রভাব পড়েছে যে, চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভপাত হয়ে গেছে।

হাদিস ০২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

العين حق

"চোখ লাগা বাস্তব ও সত্য।" -সহীহ বুখারি ৫৪০৮

কিছু মানুষ এমন আছে যে, এরা যদি কোনো সুন্দর ব্যক্তি বা জিনিসের দিকে তাকায় তাহলে নজর লেগে যায়। নজর লাগা ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি কোনো কোনো সময় মারাও যায়।

দেখার বিষয়, ব্যক্তি কিন্তু তাকে কিছু করেনি। তাকিয়েছে শুধু। ব্যস, এতটুকুই।

সাপ এবং চোখের যে তা'ছির যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং বাস্তবতাও এর সাক্ষী- এটি দুইভাবের কোনো একভাবে হতে পারে,

১. হয়তো সাপ বা ব্যক্তির চোখ থেকে কোনো বিষ বেড়িয়ে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর পড়েছে;

২. কিংবা কোনো কিছুই বেরোয়নি, তাকানোর দ্বারাই আল্লাহ তাআলা তার মাঝে রোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية —فتح الباري ١٠٢\٠١

"তা'ছির হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়। তা শুধু শারীরিক সংস্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কখনও এভাবেও হতে পারে আবার কখনও মুখোমুখী হওয়া এবং কখনও শুধু তাকানোর দ্বারাও হতে পারে।

" –ফাতহুল বারি ১০/২০১

বুঝা গেল, একজন দ্বারা আরেকজনে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শারীরিক সংস্পর্শও অনেক সময় দরকার পড়ে না। অনেক সময় শুধু সামনা সামনি হওয়া এবং অনেক সময় শুধু তাকানোর দ্বারাই হয়ে যেতে পারে। ইবনে হাজার রহ. বিষয়টি আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। বিস্তারিত সেখানে দেখা যেতে পারে।

আমাদের গত পর্বে এ হাদিসটি গিয়েছে,

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

তাদের দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকাও আক্রান্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। তবে সকল রোগই যে তাকানোর দ্বারা বা সংস্পর্শের দ্বারা সংক্রমিত হয় তা না। কিছু কিছু রোগে এমন হতে পারে।

যাহোক, সব মিলিয়ে বুঝা গেল, একজনের সংস্পর্শে, চলাফেরায় ও উঠা-বসায় আরেকজন আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি ইসলামী আকিদার পরিপন্থী নয়, যখন আমার বিশ্বাস থাকবে যে, এ আক্রান্ত হওয়াও আল্লাহর ইচ্ছায়। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে হবে না। যাদের বেলায় হচ্ছে না তাদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নেই। ওয়াল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

করোনা মহামারি ০২

প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা - ০১

ইলম ও জিহাদ

গত দুই পর্বে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কিছু কিছু রোগ এমন আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সাধারণত একজন থেকে অন্য জনের মাঝে ছড়িয়ে থাকে।

যখন ছড়িয়ে থাকে তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ছড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করে থাকা। বেসবর না হওয়া। হা হুতাশ না করা। এতে আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো মুমিনকে আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ দেন তার দারাজাত বুলন্দ করার জন্য। মুমিন যখন বিপদে সবর করে তখন তার গুনাহ মাফ হয় এবং দারাজাত বুলন্দ হয়।

আমরা যদি হাদিসগুলো লক্ষ করি দেখবো যে, শরীয়ত চতুর্দিক থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে-

আক্রান্ত উটের পালকে সুস্থ উটের পালের সাথে মিশাতে না করেছেন।

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।"

–সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

সংক্রমণ রোগে উটেরই যখন এ বিধান তখন মানুষের বেলায় এমনটা হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। অতএব, সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থদের সাথে মিশতে যাবে না। এ কারণেই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জুযাম তথা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জনসমাগমে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি ১০/২০৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৪)

সুস্থ ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও মানা করেছেন।

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

"সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।"

–সহীহ বুখারি ৫৩৮০

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এ ধরনের নির্দেশ শুধু কুষ্ঠ রোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সকল সংক্রমণ রোগের বেলায়ই এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

আক্রান্ত এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতেও নিষেধ করেছেন।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।" –সহীহ বুখারি ৫৭২৮

কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।
–সহীহ বুখারি ৫৭২৮

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সংক্রমণ রোগের বেলায় আমরা চতুর্দিক থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্দেশনা পেলাম-

এক. আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মিশবে না।

দুই. সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিশবে না।

তিন. আক্রান্ত এলাকায় কেউ যাবে না।

চার. আক্রান্ত এলাকার কোন লোকও বাহিরে বের হবে না।

এভাবে এলাকা থেকে এলাকায় বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সকল পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যত সিস্টেমই বের করুক- ইসলামের এ নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যবস্থাও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করতে পারবে না।

এলাকা থেকে এলাকায় যেন না ছড়ায় এজন্য লক ডাউন করা হয়েছে- এর ধারণা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেন না ছড়ায় এজন্য কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে- এ ধারণাও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে না।

এছাড়া হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, হাঁচির সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন ইসলামের নিত্যদিনের শিক্ষা।

আজ পত্রিকার পাতা খুললেই আপনি চীনের প্রশংসা দেখতে পাবেন। কিভাবে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের সংক্রমণ কমিয়ে এনেছে- এ নিয়ে চীনাদের প্রশংসার শেষ নেই। কিন্তু নিমুকহারাম এসব সাংবাদিক কলামিস্টদের যবানে ইসলামের প্রশংসা একবারও বের হয় না। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতার শিকার না হই।

বি.দ্র.

ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হোক রোগ দেয়া নেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি যতক্ষণ না চাইবেন রোগ যাবে না। এজন্য ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হচ্ছে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। মৃত্যুও বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুতে না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিৎ তাওবা করে আল্লাহ তাআলা দিকে রুজু হওয়া। দোয়া করা। আর সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত হয়ে গেলে সওয়াবের নিয়তে সবর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(চলমান)

ভাইরাস হতে পুরো পৃথিবীর মুক্তির জন্য দোয়া; ওয়ালা-বারার দুঃখজনক বিস্মৃতি

আদনানমারুফ

ওয়ালা-বারা কুরআনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট মাসয়ালা সমূহের একটি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এই মাসয়ালাটিই উম্মতের নিকট সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়ে গেছে। তাই আজ অনেক আলেমকেই এ জাতীয় দোয়া করতে শোনা যাচ্ছে, "হে আল্লাহ! আপনি সারা পৃথিবীর লোকদের করোনা হতে মুক্তি দান করুন।" কিন্তু শরিয়ত কি এধরণের দোয়ার অনুমতি দেয়? একদিকে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী অপরদিকে তার শত্রুদের প্রতি মহব্বত, তাদের মুক্তির জন্য দোয়া? আপনার বন্ধু বা নিকটজনের সাথে যদি কেউ শত্রুতা করে তবে কি আপনি তার সাথে শত্রুতা করবেন না? তাকে ঘৃণা করবেন না? তাহলে আল্লাহর শত্রুদের ঘৃণা করতে, তাদের জন্য বদদোয়া করতে কেন আপনার বাধে?

এখন তো দোয়ার পদ্ধতিটা এমন হওয়ার দরকার ছিল- হে আল্লাহ, আপনি মুসলমানদের উপর অত্যাচারী এ কাফেরদের মাঝে মহামারী আরো বাড়িয়ে দেন, এর মাধ্যমে তাদের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে শেষ করেন, তাদের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দেন। আর মুমিনদের এ থেকে মুক্তি দান করুন। এটাই তো কুরআন-সুন্নাহ আমাদেরকে শিখায়, নুহ আলাইহিস সালামের নিম্নোক্ত দোয়াটি লক্ষ্য করুন,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

"নূহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকী রাখবেন না। আপনি তাদেরকে বাকী রাখলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ইমানের অবস্থায় আমার

ঘরে প্রবেশ করেছে আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।”

–সূরা নূহ, ২৬-২৮

দেখুন, আয়াতে নূহ আলাইহিস সালাম একইসাথে কাফেরদের উপর কঠিন বদদোয়া করছেন আর মুমিনদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করছেন। এটাই তো ওয়ালা-বারা- কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, মুমিনদের প্রতি কোমলতা।

বীরে মাউনার ঘটনায় যখন কাফেররা সত্তর জন মুসলিমকে হত্যা করে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ একমাস ফজরের নামাযে তাদের উপর বদদোয়া করেন। আনাস রাযি. বলেন,

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداة، على رعل، وذكوان، وعصية. صحيح البخاري (٤١٨٢) صحيح مسلم (٧٧٦)

“র’ল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যাহ গোত্র যারা বীরে মাউনার সাহাবীদের হত্যা করেছে তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশদিন বদদোয়া করেছেন।” -সহিহ বুখারী, ২৮১৪ সহিহ মুসলিম, ৬৭৭

ফকিহগণ বলেছেন, “মুসলমানরা কোন দারুল হারবে গিয়ে যদি বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু দেখতে পায় তবে ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিবে এবং বিচ্ছুর কাটা বের করে ফেলবে, কিন্তু সেগুলোকে একেবারে হত্যা করে ফেলবে না, যেন সেগুলো বংশবৃদ্ধি করে কাফেরদের দংশন করতে পারে।”

-ফতোয়া শামী, ৪/১৪০

ইসা আলাইহিস সালাম ও দাউদ আলাইহিস সালামও বনী ইসরাইলের কাফেরদের উপর বদদোয়া করেছিলেন, যার কারণে আল্লাহ তাদের বানর ও শূকরে পরিণত করে দেন। -সূরা মায়েদা, ৭৮ আহকামুল কুরআন, জাসসাস রহ. ৪/১০৪

মুসা ও হারুন আলাইহিস সালাম ফেরআউন ও তার কওমের জন্য বদদোয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করেছেন। ফেরআউন ও তার অনুসারীদের লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। -সূরা ইউনুস, ৮৮-৯২

উমর রাযিআল্লাহু আনহুর যমানায় সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর পরে বিতরের নামাযে কাফেরদের জন্য এই বদদোয়া করতেন-

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق،ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين،

“হে আল্লাহ, আপনি কাফেরদের ধ্বংস করুন, যারা আপনার পথ থেকে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, আপনার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আপনি তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিন, তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিন এবং তাদের উপর আপনার আযাব-গযব নাযিল করুন।

এরপর রাসূলের উপর দরূদ পড়তেন এবং মুমিনদের জন্য যতবেশি পারতেন কল্যাণের দোয়া ও ইস্তেগফার করতেন।

-সহিহ ইবনে খুযাইমা, ১১০০

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কাফেরদের শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমরা কাপুরুষতার কারণে তা করিনি। আমাদের কার্যকলাপে প্রতীয়মান হয় বনী ইসরাইলের মতো আমরাও বলি, ‘হে আল্লাহ, আপনিই গিয়ে যুদ্ধ করুন।’ যাই হোক, আমাদের কারণে তো আল্লাহ তার মাযলূম বান্দাদের ছেড়ে দিবেন না।

হে আল্লাহ, আপনি কাফেরদের ধ্বংস করুন, যারা আপনার পথ থেকে বাধা প্রদান করে, আপনার রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, আপনার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আপনি তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিন, তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিন এবং তাদের উপর আপনার আযাব-গযব নাযিল করুন।

এরপর রাসূলের উপর দরূদ পড়তেন এবং মুমিনদের জন্য যতবেশি পারতেন কল্যাণের দোয়া ও ইস্তেগফার করতেন।

আমরা তাদের সাহায্য না করলেও আল্লাহ করোনার মাধ্যমে তাদের সহায়তা করেছেন, তাদের উপর অত্যাচারী কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। কিন্তু এতেও আমাদের আপত্তি! কোথায় এই প্রতিশোধে খুশি হবেন, কাফেরদের জন্য আরো বদদোয়া করবেন, কিন্তু না, এখানে অসহায় (?) কাফেরদের জন্য আমাদের দরদ উথলে উঠছে, তাদের মুক্তির জন্য আমরা দোয়া করছি!

আসলে এসব কিছুই ওয়ালা-বারার মাসয়ালার বিস্মৃতির পরিণতি। শায়েখ আবু মুহাম্মদ মাকদিসী যথার্থই বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিম-কাফেরের মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না তার জন্য পুরো দ্বীনই এলোমেলো হয়ে যাবে। তার নিকট দ্বীনের সব বিধিবিধান উলট-পালট হয়ে যাবে।" (আররিসালাতুছ ছালাছিনিয়্যাহ, পৃ:১০) পরিস্থিতি আজ এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (হাফিযাহুল্লাহু) এর মতো বিদগ্ধ আলেমও প্রকাশ্য নাস্তিক কবি শামসুর রহমানের জঘন্য উক্তি "আযানের শব্দ বেশ্যার আওয়াজের মতো মনে হয়"-এটা উদ্ধৃত করেও এই কাফেরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছেন। (তুরস্কে-তুর্কিস্তানের সন্ধানে) অথচ তিনি ইতিমধ্যে কুরআনের একটি তাফসীরও রচনা করেছেন আর কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে নিষেধ করছে, ইরশাদ হয়েছে,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।

-সূরা তাওবা, ১১৩

ওয়ালা-বারা ও জিহাদের মাসয়ালায় বড়দের এধরণের বিচ্যুতি আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে, তবে সেই সাথে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মান তাদের সম্মানের চেয়েও বহুগুণ বেশী। তাই সম্মান করতে গিয়ে তাদের অন্ধ-অনুসরণ করা যাবে না। এটাই আল্লাহ তায়ালার পরীক্ষা। তিনি দেখতে চাচ্ছেন, আমরা কি আমদের বড়দের পূজা করি, না আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য করি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

الجهاد محك الإيمان

জিহাদ ইমানের কষ্টিপাথর

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

এটা নবী ও মুমিনদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাতে তারা আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।

-সূরা তাওবা, ১১৩

তামিম আদনানিকে নিয়ে সংশয়ের জওয়াব

ইলম ও জিহাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصبحه أجمعين. أما بعد

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের ছেলে আব্দুল্লাহ এক প্রশ্নের উত্তরে তামিম আদনানি হাফিজাহুল্লাহর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে যে, তিনি মাজহুল। আর মাজহুলের বয়ান শুনা বা তার থেকে ইলম নেয়া জায়েয নেই।

এর আগেও কেউ কেউ এ ধরনের সংশয় ছড়িয়েছিল। এক ভাই বিষয়টির সমাধান জানতে চেয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমি বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

এক.

যারা বলেন, তামিম আদনানি মাজহুল, তার থেকে ইলম নেয়া যাবে না: আসলে তাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে শরীয়তের উপর উঠানো, না'কি জিহাদ থেকে সরানো- একটু খেয়াল করে দেখা উচিৎ।

আসলে কি এ কথা তারা এ জন্য বলছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তামিম আদনানির বয়ান শুনা হারাম হচ্ছে তাই জনসাধারণকে হারাম থেকে সতর্ক করছে, না'কি জিহাদ বিরোধী মিশন এবং তাগুতের দালালির অংশ হিসেবে বলছে- এ ক টু ফিকির করা উচিৎ।

দুই.

মাজহুলের বিধান কি শুধু তামিম আদনানির উপরই প্রযোজ্য না'কি অন্য সকলের বেলায়ই প্রযোজ্য? তাদের শায়খদেরকে ক'জন চেনে? তারা যে শত শত কিতাব রিসালা আপলোড করে সেগুলোর লেখকদেরকে ক'জন চেনে?

যেমন ধরুন, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। তার ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করি-

১. তার বাড়ি কোথায়?

২. তার বংশ পরিচয় কি?

৩. তিনি কোথায় কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

৪. তিনি কি কি যোগ্যতা লাভ করেছেন?

৫. তিনি কি তার উস্তাদ, পিতা মাতা ও অন্যান্য মুরব্বির ফরমাবরদার ছিলেন, না□কি নাফরমান ও অবাধ্য ছিলেন?

৬. তিনি কি পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন না

অমনোযোগী?

৭. ছাত্র যামানায় তিনি কি একজন দ্বীনদার তালিবে ইলম ছিলেন নাকি ভবঘুরে ও ফাসেক প্রকৃতির ছাত্র ছিলেন?

৮. তার উস্তাদগণ তার ব্যাপারে কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন? তারা কি তার জন্য দোয়া করেছেন না□কি বদদোয়া করেছেন?

৯. উস্তাদগণ কি তাকে কিতাবাদি পড়ানো, ওয়াজ নসিহত করা ও ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন না□কি দেননি? না□কি অযোগ্য হওয়ার কারণে এ থেকে বারণ করেছেন?

১০. পরিবারের লোকদের সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে তিনি কি ভাল ব্যবহার করেন? তাদের হক আদায় করেন? না□কি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদের হক নষ্ট করেন?

১১. তিনি কি নামাযি না□কি বেনামাযি?

১২. আদেল না ফাসেক?

১৩. সর্বোপরি তিনি কি বয়ান বক্তৃতা ও ফতোয়া প্রদানের যোগ্য না□কি অযোগ্য?

এ প্রশ্নগুলো তাদের একজন প্রসিদ্ধ শায়েখের ব্যাপারে করলাম। জিজ্ঞেস করি, এদেশের কতজন আহলে হাদিস এ প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাযথ জানেন? যদি না জেনে থাকেন তাহলে তার বয়ান শুনেন কিভাবে আর তার মাসআলা মাসায়েল নেন কিভাবে?

আহলে হাদিসের তিনি তো একজন প্রসিদ্ধ শায়খ। আর যাদেরকে কেউ চিনে না, কখনও বাস্তবে দেখেনি- তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

আর তাদের সাইটে যেসব কিতাব-রিসালা আপলোড দেয়া হয়, সেগুলোর লেখক অনুবাদকেরও তো একই হালত। সেগুলো ডাউনলোড করা ও পড়া কি তাদের দৃষ্টিতে হারাম হবে?

কাজেই তামিম আদনানিকে নিয়ে উঠেপড়ে লাগার আগে নিজের ঘরের খবর নিই।

তিন.

তামিম আদনানি বয়ান বক্তৃতায় ফতোয়া দিতে আসেন না। তিনি স্বাভাবিক এমনসব বিষয়ে সতর্ক করেন যেগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া স্বত্বেও আমরা দেখি না বা দেখলেও সেভাবে অনুধাবন করি না।

আর মাসআলা মাসআয়েল যেগুলো আলোচনা করেন, সেগুলো তিনি নিজে থেকে বলেন না, প্রসিদ্ধ আইম্মায়ে কেরাম ও কিতাবাদির হাওয়ালায় কুরআন সুন্নাহ থেকে বলেন। এমনসব বিষয়ে কথা বলেন যেগুলো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের বর্তমান যামানার প্রতিটি মুসলমানের জানা থাকার কথা ছিল। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে একেবারে সাদামাটা কথা বলেন যেগুলো আমাদের আগে থেকেই জানা থাকার কথা ছিল। আমরা যখন গাফেল হয়ে আছি তখন তিনি আমাদের একটু সতর্ক করে দিচ্ছেন মাত্র।

তামিম আদনানির উদাহরণে অনেকটা এমন:

- এক এলাকায় রাতের গভীরে আগুন লেগেছে। কেউ টের পাচ্ছে না। দূর থেকে একজন অপরিচিত মুসাফির দেখতে পেয়ে পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে এলাকাবাসীকে ডেকে বলছেন, হে এলাকাবাসী! দ্রুত জাগ্রত হন। আপনাদের বস্তিতে আগুন লেগেছে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

- কিংবা এক এলাকায় সকলের অগোচরে শত্রু হামলা করতে আসছে। দূর পাহাড় থেকে একজন দেখতে পেয়ে এলাকাবসীকে সতর্ক করার জন্য চিৎকার করছেন।

এ ধরনের ক্ষেত্রে কেউ দ্বিমত করবে না যে, উক্ত অজানা অচেনা লোকের চিৎকারে সাড়া দিয়ে জাগ্রত হওয়া ও সতর্ক হওয়া সময়ের দাবি। মাজহুল লোকের এ চিৎকারকে কেউ ফতোয়া বলবে না। তার ডাকে সাড়া দিলে কেউ মাজহুল থেকে ফতোয়া নেয়া হচ্ছে বলবে না। একথাও কেউ বলবে না যে, তার ডাকে সাড়া দিয়ে আগুন ও শত্রু বাহিনীর ব্যাপারে সতর্ক হলে বা খোঁজ খবর নিলে হারাম হবে।

অতএব, ভয়ানক কোন কিছুতে কারো ডাকে সতর্ক হওয়া এক জিনিস আর মাজহুল থেকে ফতোয়া নেয়া আরেক জিনিস। একেবারে মোটাবুদ্ধির বা মুআনিদ না হলে আশাকরি এতে কেউ দ্বিমত করবে না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এর দু'টি দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-

দৃষ্টান্ত ১

আল্লাহ তাআলা আনতাকিয়াবাসীর হিদায়াতের জন্য তিনজন রাসূল পাঠালেন। তারা রাসূলদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং হত্যার হুমকি ধমকি দিতে লাগল। এলাকার শেষ প্রান্তে হাবিব নামক এক লোক বাস করতেন। তিনি নেককার ছিলেন। ঘটনা শুনতে পেয়ে তিনি কওমের মায়ায় ছুটে আসলেন এবং কওমকে আহ্বান জানালেন, তোমরা রাসূলদেরকে মেনে চল। এতেই তোমাদের কামিয়াবি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠)

"শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। বললো, হে আমার কওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর।"

- ইয়াসিন ২০

আমরা যখন কুরআন সুন্নাহ থেকে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের নুসরত থেকে পিছপা হয়ে গেছি তখন তামিম আদনানির মতো লোকেরা আমাদের ডেকে বলছেন, তোমরা কুরআন সুন্নাহ এবং রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ আঁকড়ে ধর। স্পষ্ট যে, এটা মাজহুল থেকে ইলম নেয়া না। তিনি ঐ দরদি লোকটির মতো শুধু এতটুকু আহ্বান জানাচ্ছেন যে, তোমরা রাসূল ও সাহাবাদের আদর্শ আঁকড়ে ধর।

দৃষ্টান্ত ২

মূসা আলাইহিস সালাম কিবতিকে হত্যা করে ফেললেন। ফিরাউনের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেল। সে তার মন্ত্রী পরিষদের সাথে পরামর্শে বসেছে। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, তারা মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করে ফেলবে। এক লোক মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি দরদি ছিলেন। তিনি গোপনে এক সংক্ষিপ্ত পথ ধরলেন এবং সৈন্যদের আগেই মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছে গেলেন। গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক করে পালিয়ে যেতে বললেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٢)

"শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। আরজ করল, হে মূসা! পরিষদবর্গ আপনার ব্যাপারে পরামর্শ করছে যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। অতএব, আপনি (শহর ছেড়ে) বেরিয়ে যান। নিশ্চয়ই আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্খী। এতে তিনি ভয়ে ভয়ে পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখে (সতর্কতার সহিত) সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দোয়া করলেন, হে আমার রব! জালিম কওম থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিন।"

–কাসাস ২০-২১

আজ মুসলিমদের হালতও এমন। কুফফারগোষ্ঠী ও তাদের দালালরা উম্মাহর বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তামিম আদনানির মতো দরদি লোকেরা কওমকে গোপনে গোপনে সতর্ক করছেন। এটা ফতোয়া ও ইলম নেয়ার বিষয় নয়, বিপদে সতর্ক করার বিষয়। অতএব, চিনি না জানি না- এসব বলে জনসাধারণকে এ ধরনের দরদি লোকের বয়ান থেকে বিরত রাখার অর্থ মূসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের হাতে তুলে দিতে সহায়তা করা। বিশেষত আমরা স্পষ্টই দেখছি যে, তারা নিজেরাও কিছু বলছে না, বরং তাদের অনেকে যামানার ফিরআউনদের পক্ষে দালালি করছে।

চার.

অধিকন্তু তামিম আদনানি ধরনের ব্যক্তিদের যে অর্থে মাজহুল বলা হচ্ছে তারা সে অর্থে মাজহুল নন। তামিম আদনানিকে মাজহুল বলা যেতে পারে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে জীবনের এই প্রথম তামিম আদনানির একটা বয়ান ইউটিউবে দেখতে পেলো। এর আগে সে তামিম আদনানি সম্পর্ক কিছু জানে না। কারো কাছ থেকে তার ব্যাপারে কিছু শুনেওনি। তিনি ভাল না মন্দ, বিদআতি না আহলে হক, দরবারি না দরদি- কিছুই জানে না। এ ধরনের ব্যক্তির বেলায় বলা যেতে পারে যে, তামিম আদনানি মাজহুল। তার বেলায় আমরা বলবো না যে, আপনি তামিম আদনানি থেকে ইলম নিন। বরং যাচাই বাছাই করে নিতে বলবো।

পক্ষান্তরে সাধারণত যারা তামিম আদনানির বয়ান শুনেন, তারা বিভিন্ন মাধ্যমে স্পষ্ট করেই জানতে পেরেছেন যে, তামিম আদনানি একজন হকপন্থী ও দরদি মানুষ। তিনি কুরআন হাদিসের আলোকে হক ও সত্য কথা বলেন। উম্মাহর দুশমন ও দরবারিদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল ও অপব্যাখ্যার ব্যাপারে উম্মাহকে সতর্ক করেন। অনলাইন-অফলাইন সব মিলিয়ে এমন অনেক মাধ্যমে তিনি বিষয়টি জানতে ও অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, এ ব্যাপারে তখন আর সন্দেহ থাকে না। তিনি তখন ঐ ব্যক্তির মতো নন, যিনি কোনে জানা শুনা ছাড়াই জীবনের প্রথম কোনো বক্তার বয়ান ডাউনলোড করছেন।

তামিম আদনানিদের বিয়ষটা অনেকটা এমন:

- কোনো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে দুয়েকজন নির্ভরযোগ্য দূত মারফত কোনো ফরমান আসলো। এরপর সে ফরমান ছড়াতে ছড়াতে সারা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে গেল।

- কিংবা কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা ডেইলি সংবাদ বা খবরের মাধ্যমে জনগণকে সতর্ক করা হলো, অচিরেই আমাদের দেশে শত্রু বাহিনী হামলা করবে। সকলে সতর্ক থাকবেন। কিংবা দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। সকলে সাবধান।

- কিংবা ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি ওয়েবসাইট খোলা হলো। সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনসাধারণের ইসলাহের জন্য নিয়মিত বয়ান আপডেট দেয়া হয়। বক্তাদের সম্পর্কে জনগণ কিছু জানে না। তবে বয়ানের সাথে বক্তার নাম ও দেশের নাম দেয়া থাকে। এভাবে চলতে চলতে কয়েকজন বক্তা প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলে তাদের নাম জানে। তাদের ভাল মনে করে। শ্রদ্ধা করে। তাদের বয়ানের অপেক্ষায় থাকে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে কেউ বলবে না যে, মাজহুল। তার কথা বিশ্বাস করা বা তার বয়ান শুনা হারাম। ... ইত্যাদি।

অতএব, তামিম আদনানিকে মাজহুল বলার আগে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার হাইসিয়্যাত নিয়ে আবারও ফিকির করার আহ্বান জানাচ্ছি। নিজের মনমতো একটা বলে দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করলে এর দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে। আর আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানেন, ইসলাহ কার উদ্দেশ্য আর বিভ্রান্তি ছড়ানো কার উদ্দেশ্য।

অধিকন্তু আমরা এ কথাও বলি না যে, আপনারা অন্ধভাবে তামিম আদনানিদের কথা বিশ্বাস করে আমল শুরু করুন। বরং আপনারা নিজেরাই যাচাই বাছাই করে দেখুন, তারা সত্য বলেন কি'না। চোখ তো আপনাদেরও আছে। আর বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তো আপনাদের চোখেরই সামনে। ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করা সকলের উপর ফরয। তামিম আদনানিরা তো কেবল সতর্ক করে যাচ্ছেন। বাকি দায়িত্ব কিন্তু আপনাদেরই। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

কমেন্ট

ALQALAM

Senior Member

মাশাআল্লাহ!

আয় বেটা দেখি কে ঠেকাস!? তোরা যতই ষড়যন্ত্র করিসনা কেন ভাবিসনা সেটা তাওহীদবাদীদের ক্ষতি হচ্ছে, বরং সেটায় তাওহীদীদের আরো বেশি লাভ! হয়তো আগে মানুষ দলীলহীনভাবে তামিম আল আদনানী হাফিজাহুল্লাহু তায়ালাকে ভালোবাসতো যাহা দলীলভিত্তিক ভালোবাসার চেয়ে দূর্বল, কিন্তু আজ থেকে তারা দলীলভিত্তিক ভালোবাসবে আর বিভ্রান্ত কারীদের হিংসার আগুনে পেট্রোল পড়বে, কারণ ষড়যন্ত্র তুমি যাই করোনা কেন(?) তোমার স্রষ্টার কৌশলের কাছে তুমি কিছুই নও! সুবহানাল্লাহি মা আ'দালাক!

হে হিংসুক তুমি মরে যাও! কেননা হিংসার এই আগুন/কষ্ট মৃত্যু ছাড়া কেউই নেভাতে পারেনা

শেখ সা'দী

ইয়া আল্লাহ, আপনি ভাই এর ইলমে আরো বারাকাহ দিন! ইয়া আল্লাহ, উনার দ্বীনি সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন! দ্বীনের সকল খিদমায় উনাকেও শামিল রাখেন! শাহাদাতের দৌলতে ভাইকে আনন্দিত করুন! জান্নাতের সু-উচ্চ মাকামে কলিজার টুকরো প্রাণের চেয়েও প্রিয় যোদ্ধা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গী হিসেবে কবুল করে নিন! আমিন! আমিন! আমিন! ইয়া রব্বাল আলামিন!!

হয় শাহাদাহ নাহয় বিজয়।

এ পোস্টের সাথে প্রাসঙ্গিক অন্য একটি পোস্টের কিছু কমেন্ট:

১/ Bara ibn Malik

Senior Member

তথাকথিত আহলে হাদিস,, প্রিয় আহলে হাদিস ভাইয়েরা, কথা বলুন কুরআন সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে। আপনারা অতীতে তালিবান - আল কায়দার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু যখন তালিবানদের বিজয় দেখলেন, তখন আপনাদের শাইখরা কথা পাল্টিয়ে তালিবানের পক্ষে বলা শুরু করে দিলো!! একজন আলিম কীভাবে বিশ্বের হাল অবস্থা না জেনে বলেন। আমরা আপনাদের শত্রু নয়, আপনারা আমাদেরকে যতই আঘাত করুন, আমরা আপনাদের আঘাত করবো না, ইনশাআল্লাহ। আমাদের টার্গেট হলো কাফের ও নাস্তিকরা। আমরা আপনাদের বিরোধিতার কারণে ঘরে বসে যাবো না। আর আপনারা জিহাদের ফলাফল লক্ষ করছেন। আপনারা যাদের সমীহ করেন, আমরা তাদেরকে আফগান থেকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছি। সামনে ইনশা-আল্লাহ সোমালিয়া থেকেও বের করে দেওয়া হবে, ইনশা- আল্লাহ।

২/ salahuddin aiubi

Senior Member

এটার সদুত্তর আছে। মাজহুল ব্যক্তি থেকে ইলম নেওয়া হারাম কখন সেটা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে বুঝাতে হবে। যে ইলমটা শুধু শোনার উপর নির্ভরশীল, কোন বাস্তব প্রমাণ নেই সেক্ষেত্রে কার থেকে ইলমটা নেওয়া হল, সেটা গভীরভাবে যাচাই করতে হবে। কিন্তু যেখানে প্রত্যেকটা কথার প্রমাণ মানুষের হাতের নাগালের কিতাবগুলোতেই পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে ব্যক্তি কোন বিষয়ই না।

জানাশোনা বিশ্বস্ত লোক থেকে ইলম নেওয়ার ব্যাপারে যে

হাদিস ও আসারগুলো এসেছে, সেগুলো মূলত হাদিসের সনদের ব্যাপারে, যখন হাদিসের লিখিত ভলিয়মগুলো সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে নির্ভরযোগ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, তখন। কিন্তু এখন তো সব হাদিস দুনিয়ার সব মানুষের কাছে লিখিত কিতাব আকারে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাচ্ছে। সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ফিকহের কিতাবগুলোও হাতের নাগালেই পাওয়া যাচ্ছে।

তাই আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক ইমামদের কথার উদ্দেশ্য, মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্রই বুঝতে পারেননি। উনি এক জায়গার কথা আরেক জায়গায় এনে লাগিয়েছেন। এটা ইলমের মধ্যে অত্যন্ত কাঁচা ও প্রাথমিক হওয়ার কারণেই।

আমি সংক্ষেপে শুধু সারকথাটা বললাম। ভাইয়েরা অতীত-বর্তমান উলামাদের উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত বলবেন, ইনশাআল্লাহ।

৩/ With Guraba

Senior Member

আহলে হাদিস ভাইয়েরা, আশাকরি আপনাদের মিল্লাতে ইব্রাহিম এর ইলম অজানা নয়। কিন্তু আপনাদের কথা কাজ তার উল্টো দেখতেছি। আল্লাহকে ভয় করুন, মুসলিমদের গণহারে হত্যা করা হচ্ছে, আর আপনারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন!? এটা কীভাবে সম্ভব হলো আপনাদের দ্বারা??? আপনারা তো দাবী- আপনারা সহীহ আকিদার উপর আছেন, তাহলে প্রশ্ন করি মুসলিমদের পাশে না দাঁড়ানোই কি ছহিহ আকিদার দাবী???? এগুলো বন্ধ করুন। আপনারা কি চান??? আমরাও আপনাদের বন্ধু মুহাম্মদ বিন সালমানের মতো ইউএসের কুকুরগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করি??? কখনোই নয়। আফগানের অবস্থা আপনাদের অজানা নয় আশা করি। আর আপনারা আমাদের যতই জ্বালাতন করেন, আমরা আপনাদেরকে ভাইই মনে করে যাবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ, আপনি আমাদের রব। আল্লাহ, আপনি করোনা ভাইরাস থেকে বিশ্বের মুসলিমদের হিফাজত করুন আমীন।

৪/ মোল্লা তাহসিন

Junior Member

আজ সবখানে মুসলমান নির্যাতিত, উম্মাহর দরদী হক আলেম দিয়ে তাগুতের জেলখানা ভরপুর,

বর্তমান সময়ে হক কথা বলার জন্য বা ভারতের বিপক্ষে কথা বলার কারণে গুম, খুন করা হচ্ছে,

তাই উম্মাহর পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং জিহাদের ফরজিয়াত আদায় করার জন্য এগিয়ে আসলো

কিছু সংখ্যক আলেম; যারা আমাদের মত দুনিয়া নামক কুকুরের পিছনে না পরে

নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে, নিরাপত্তার জন্য নিজের নাম, ঠিকানা গোপন রেখে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলছে

আর নামধারী কিছু আহলে হাদীস তাদের পিছু নিয়েছে, আমরা জানিনা এতে তাদের কি ফায়দা আছে!!!!

আলেম হওয়া পরের কথা ইলমুল হালও নাই

তাই এমন মন্তব্য করে!!!

আমরা সকলেই জানি, এখন সকল মুসলমানের জিহাদ উপর ফরজে আইন,

এখন ঐ শায়েখের নিকট আমার প্রশ্ন হলো? আপনার নিকট কি জিহাদ ফরজে আইন আদায় করার জন্য ইলম আছে যার দ্বারা আপনি এই ফরজ থেকে মুক্ত হবেন???

না কি আপনার উপর জিহাদ ফরজ হয়নি?

যদি থাকে তাহলে বলেন? আধুনিক বিশ্ব কুফুরের সাথে ইসলাম বিজয় হওয়ার জন্য যুদ্ধের কোন মূলনীতি অবলম্বন করবেন? না এমন ইলম অর্জন করা আপনাদের সহিহ হাদীসে নাই?

দাজ্জালের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ আপনার দ্বারপ্রান্তে!!!
আপনি কি এখনো সন্দিহান???

(দলীলসমূহ ও বিশ্লেষণ) পর্ব- ১

মুসাফির ভাই

بسم الله و الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده وعلي آله وأصحابه أجمعين . أما بعد.

বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত বিষয় হচ্ছে, ইমাম মাহাদী (আঃ), তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাজ্জাল ও ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ)। আমরা এখানে কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও বর্তমান বিশ্বকে সামনে রেখে দেখব দাজ্জালের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের আর কত সময় বাকি আছে, ইনশাআল্লাহ। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি। প্রথমেই সহীহ বুখারী থাকে একটি হাদীস,

سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهْوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ " اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ، مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ".

আউফ ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামত গণনা করে রাখো।

১। আমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) মৃত্যু,

২। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়,

৩। তারপর তোমাদের মাঝে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত (এই মহামারী দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সাহাবীদের বংশধরকে ও তাঁদের শাহাদত নসীব করবেন এবং তাঁদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন। ইবনে মাজাহ: নং ৪০৪২)।

৪। সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে।

৫। তারপর এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে।

৬। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মোকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য দল থাকবে (এই যুদ্ধের পরে হবে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ -সুনানে ইবনে মাজাহ)

[সহীহ বুখারী (ইফাঃ) ২৯৫২ , ৩১৭৬ ; (সুনানে ইবনে মাজাহ: কলহ-বিপর্যয় নং ৪০৪২)]।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, এই বিষয়গুলো ধাবাহিকভাবেই ঘটবে। তাই আসুন! পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করি:

১। আমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) মৃত্যু:

১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে প্রিয় নাবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ষষ্ঠ খণ্ড)। এছাড়াও আয়িশা (রাঃ) বলেন, যেদিন আমার পালা আসলো, সেদিন আল্লাহ তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষের মাঝে (হেলান দেওয়া অবস্থায়) রূহ কবয করলেন এবং আমার ঘরে তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) দাফন করা হয়। {সহীহ বুখারী (ইফাঃ) অধ্যায়ঃ ২০/ জানাযা (كتاب الجنائز), হাদিস নম্বরঃ ১৩০৬ }

২ । তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়:

বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের প্রথম কিবলা। ১৫/১৬হিজরীতে হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সপ্তম খণ্ড, পৃ-১০৭ ই.ফা.), (মহাপ্রলয়- আব্দুর রহমান আরিফী পৃ: ৩২)। এছাড়াও সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহঃ) ৫৮৩ হিজরী সনে পুনরায় বিজয় করেন(মহাপ্রলয়- আব্দুর রহমান আরিফী পৃ: ৩২)।

সুতরাং দ্বিতীয় আলামত বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় তাও সম্পন্ন হয়েছে। হয়তো অনেকেই বলতে পারেন যে এখনতো মুসলিমদের হাতে নাই, তাহলে আলামত কি করে পূরণ হল? দেখুন! ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন যে, বিজিত হওয়া (فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) শর্ত, বিজিত থাকা শর্ত না। এছাড়াও আপনারা জানেন যে কিয়ামতের পূর্বে মুজাহিদদের হাতে আবার বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে। ইনশাআল্লাহ।

৩। তারপর তোমাদের মাঝে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত:

মহামারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক আজাব, কিন্তু মুমিনদের জন্য রহমত। মহামারীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের শাস্তি দেন, আর মুমিনদের শাহাদাত নসীব করেন এবং তাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করেন (সহীহ বুখারী -ইফাঃ হাদিস নং ৬৫০৩ (সুনানে নাসাঈ - ইফাঃ হাদিস নং ২০৫৮ - সহিহ)।

বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর যে মহামারী প্রকাশিত হবে সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ دَاءٌ يَظْهَرُ فِيكُمْ يَسْتَشْهِدُ اللَّهُ بِهِ ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَيُزَكِّي بِهِ أَمْوَالَكُمْ

"বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এক মহামারী ছড়িয়ে পড়বে, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে শাহাদত নসীব করবেন এবং তোমাদের আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করবেন।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ৩০/ কলহ-বিপর্যয় (كتاب الفتن) : হাদিস নং ৪০৪২-তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।)

فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ

"বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, তারপর তোমাদের মাঝে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত"

(সহীহ বুখারী- ইফাঃ - হাদীস নং ২৯৫২)

উপরিউক্ত হাদীস দুইটি থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই মহামারী সাহাবীদের মাঝে এবং তাঁদের বংশধরদের মাঝে প্রকাশিত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের বংশধরকে ও তোমাদেরকে (ذَرَارِيَّكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর শাসনামলে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের দুই বছর পর ১৮হিজরীতে "আমওয়াছ মহামারীর" ঘটনা ঘটে। এই মহামারীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলমান মারা যায়। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ), আবু উবায়দাহ (রাঃ), শুরাহবিল বিন হাসানা (রাঃ), ফজল বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) এর মত বিখ্যাত সাহাবীগণ এই মহামারীতে ইন্তেকাল করেন (মহাপ্রলয়- আব্দুর রহমান আরিফী পৃ: ৩৩), (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, সপ্তম খণ্ড, পৃ-১৪৫, ১৪৬ ই.ফা.)।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 'উমার (রাঃ) সিরিয়া যাবার জন্য বের হলেন। এরপর তিনি 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর কাছে খবর এল যে সিরিয়া এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) তাঁকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন স্থানে এর বিস্তারের কথা শোন, তখন সে এলাকায় প্রবেশ করো না; আর যখন এর বিস্তার ঘটে, আর তোমরা সেখানে অবস্থান কর, তাহলে তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার নিয়তে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। [সহীহ বুখারী (তাওহীদ): হাদিস নং ৫৭৩০ (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২০৬)]

৬৭ হিজরী, ৮৭ হিজরী, ১১৯ হিজরী এবং ১৩৬ হিজরীতে কয়েকবার এ ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়েছিল

[সহীহ মুসলিম (হাঃ একাডেমী) অধ্যায়ঃ ০। মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা)(المقدمة) হাদিস নম্বরঃ ৭ এর টীকা]।

এছাড়াও পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ তায়ালা মহামারী দিয়ে অনেক বার-ই পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দিয়েছেন। মহামারিতে শতশত নগর সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন,

৬০০ শতকে দুনিয়ায় ৪০%, ৭৩৫-৭৩৭ এই দুই বছরে জাপানে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ১৬ শতকে ম্যাক্সিকোতে ৮০%, ইতালিতে ৩ লক্ষ , দুনিয়াব্যাপী ফ্রক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, অজানা রোগে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। এশিয়া ও ইউরোপে মারা যায় ৫ কোটি । ১৪'শ শতাব্দীতে বিশ্বের জনসংখ্যা ৪৫০ মিলিয়ন থেকে ৩৫০-৩৭৫ মিলিয়নে নেমে আসে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আমেরিকা মহাদেশে প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ, ১৬৩৩ সালে প্রায় ২ কোটি, ১৬৬৫ সালের দিকে লন্ডনের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ মারা যায়। ১৭৯৩ সালে প্রায় ৪৫ হাজার, ১৮৫৫ সালে প্রায় দেড় কোটি, ১৯১৮ সালে ৫ কোটি, ১৭২০ সালে ২০ কোটি মানুষ মারা যায়। ১৮২০ সালে এশিয়ায় কলেরা রোগে মারা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং আফ্রিকা ইউরোপে বসন্ত রোগে মারা যায় ৩৫ লক্ষ মানুষ। ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সালে প্রায় ৫ কোটি, ১৯২০ সালে ৫ কোটি মারা যায়। ২০১২ সালে প্রথম সৌদি আরবে মার্স আবিষ্কৃত হয় এবং সেখানে আক্রান্তদের ৩৫শতাংশ মারা যায়। সৌদি আরব ছাড়াও এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে ওমান, আরব আমিরাত, মিসর ইত্যাদি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কটি দেশে। উইকিপিডিয়া

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, তৃতীয় আলামত "মহামারী" তাও বাস্তবায়ন হয়ে গেছে, যা হাদীস ও ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত।

ইনশাআল্লাহ বাকি তিনটি আলামত নিয়ে সামনের পর্বে আলোচনা করা হবে।

মুজাহিদদের জন্য দোয়া করতে অবহেলা করবেন না (অনুরোধ)।

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা,
প্রতিদিন অন্তত এক পারা কোরআন তেলাওয়াত
- এইগুলো হচ্ছে মুজাহিদিনের অন্তরের খোরাক;
আমরা আমল করছি তো?

মুজাহিদিনের জন্য দোয়া করতে আমরা ভুলে না যাই